তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প

অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র, ১৩৬৩
অগস্ট, ১৯৫৬

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলকাতা-১২

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
সমীর রায়চৌধুরী

ছেপেছেন
রতিকান্ত ঘোষ
দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৭।১ বিন্দু পালিত লেন
কলকাতা-৬

আমি শিশু বা কিশোরদের জন্য বিশেষভাবে কোন কিছু রচনা করিনি—এ কথা বহুজনের কাছেই শুনতে হয়েছে, এর জন্য অভিযোগও শুনেছি কখনও কখনও। এ অভিযোগ আংশিকভাবে সত্য বলেই স্বীকার করি। এবং সেই কারণেই শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার চক্রবর্তী মহাশয় যখন অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দিরের পক্ষ থেকে 'ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' সিরিজের মধ্যে আমার শ্রেষ্ঠ গল্প প্রকাশ করবার প্রস্তাব আনেন তখন পূর্বের কথা স্মরণ করে স্বভাবতই সঙ্কোচ ছিল। যাই হোক আমার গল্পের মধ্য থেকে তিনি ছোটদের উপযোগী কয়েকটি গল্প বাছাই করে 'তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প' বের করেছেন। এ সঙ্কলনে প্রকাশিত গল্পগুলি যাদের জন্য সংগৃহীত তারা আনন্দ পেলেই আমার শ্রেষ্ঠ আনন্দের কারণ হবে।

পি ১১১ সি. সি. ও. এস,
টালা পার্ক, কলকাতা-২
১৫. ৯. ৫৬.

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শকুন্তলা, জ্যোতির্ময়, হিমাদ্রি, দেবব্রত,
দিব্য, মণি, কাঞ্চন, কিশোর, মঞ্জু,
অমল, সৌম্য, নীলাদ্রি

—কল্যাণীয়েষু

সত্যপ্রিয়ের কাহিনী

এক ছিলেন রাজা। মহারাজাধিরাজ চক্রবর্তী ছিলেন তিনি। বহু রাজা তাঁকে কর দিত। সসাগরা ধরার অধীশ্বর বললেও চলে। রাজকোষ মণি-মুক্তা হিরা-জহরত সোনা-রুপায় পরিপূর্ণ, সৈন্যশালায় রাজভক্ত সুশিক্ষিত বিক্রমশালী বুদ্ধিমান বিচক্ষণ সেনাপতি,—হাতিশালায় ঐরাবতের মত হাতি,—অশ্বশালায় উচ্চৈঃশ্রবার মত ঘোড়া. অসংখ্য দাসদাসী নিয়ে রাজার সৌভাগ্য বর্ষার নদীর মত কানায় কানায় পরিপূর্ণ। রাজা নিজেও খুব বিক্রমশালী পুরুষ। প্রজা থেকে, কর্মচারী থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত কেউই রাজার মুখের দিকে চাইতে সাহস করেন না। সূর্যের দিকে যেমন চাওয়া যায় না, অমিততেজী সেই রাজাধিরাজ, তাঁর মুখের দিকেও তেমনই চাওয়া যায় না।

কিন্তু রাজার একমাত্র দোষ—রাজা ঐশ্বর্যের অহঙ্কারে মহা অহঙ্কারী। তিনি যখন চলে যান, তখন পায়ের শব্দে তাঁর দম্ভ লোকে অনুভব করে, রাজপ্রাসাদ যেন কাঁপে।

রাজার পুত্রসন্তান নাই, আছে দুটি কন্যা। বড়টির নাম মুক্তামালা, ছোটটির নাম কাজলরেখা। রাজার রানী নাই। মেয়েদুটির শৈশবেই তিনি মারা গিয়েছেন। রাজা আর বিবাহ করেন নাই। মেয়েদুটিকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসেন। তারা যা চায়, তাই দেন। মেয়েদের ধাইমা মেয়েদের মানুষ করে। তারা আপন মনে নিজের নিজের খুশিমত খেলা করে, গান গায়, হাসে, খায়-দায়। রাজপণ্ডিত আসেন,

তাঁর কাছে পাঠ নেয়। দিনে দিনে কুঁড়ি থেকে যেমন একটু একটু করে পাপড়ি মেলে ফুল ফোটে, তেমনই করে তারা বড় হয়ে উঠে।

এক বাপ-মায়ের দুই মেয়ে,—কিন্তু আশ্চর্য, রূপে গুণে দুই মেয়ে ঠিক বিপরীত। বড় মেয়ের রূপ দেখলে চোখ যেন ঝলসে যায়; আয়নাতে রোদের ছটা পড়ে তার আভা যেমন ঝকঝক করে, তেমনই রূপ তাঁর। গুণেও ঠিক তাই। শাণিত অস্ত্রের মত তাঁর স্বভাব। দাসদাসী সকলে তাঁর কাছে জোড়হাতে সশঙ্কিত হয়ে থাকে। আর ছোট রাজকুমারী কাজলরেখার রূপ শান্ত স্নিগ্ধ, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়, পূর্ণিমারাত্রির জ্যোৎস্নার মত; স্বভাবও ঠিক তেমনই মধুভরা। ফল যেমন মধুর ভারে নুয়ে পড়ে, মিষ্ট গন্ধে বুক ভরিয়ে দেয়, তেমনই ধারা মধুর প্রকৃতি তাঁর; ঠোঁটের ডগায় হাসি লেগেই আছে, কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের চাঁদের মত সে হাসিটুকু।

বড় রাজকন্যা মুক্তামালা মেয়ে হলেও অস্ত্রশিক্ষা করেছেন; তিনি ঘোড়ায় চড়েন, শিকার করতে যান, তাঁর তীর ছোটে উল্কার মত। আকাশের বুক থেকে মনের আনন্দে উড়ে বেড়ায় যে-সব পাখি, তাঁর তীর তাদের বিঁধে মাটির দিকে নামিয়ে আনে ঝড়ে ঝরে-পড়া ফুলের মত। কাজলরেখাও রাজকন্যা, সেই হিসাবে তিনিও অস্ত্রশিক্ষা করেছেন, কিন্তু অস্ত্রের চেয়ে শাস্ত্রে তাঁর অনুরাগ বেশি। তিনি ঘরে বসে নানা শাস্ত্র পাঠ করেন। পড়তে-পড়তেই দিন শেষ হয়ে যায়, ঘরের আলো কমে যায়, তিনি গিয়ে বসেন জানলার ধারে। আকাশের বুকে পাখির ঝাঁক উড়ে যায় গান করে—তাদের গান শুনে তিনি মুগ্ধ হয়ে তাদের দিকে চেয়ে থাকেন। আঁচলে করে নিয়ে যান পঞ্চশস্য, ছাদের উপর অঞ্জলি ভরে ছড়িয়ে দেন, ডাকেন তাদের,— আয়—আয়—আয়! ওরে পাখিরা, তোদের আমি ভালবাসি, তোরা খেয়ে যা। তারা শন্-শন্ শব্দে পাক দিয়ে নেমে আসে, কেউ বসে তাঁর মাথায়, কেউ বসে কাঁধে, কেউ বসে হাতে,—বসবার জায়গা যারা না পায় তারা পাক দিয়ে উড়তে থাকে, যেমন ভ্রমর ওড়ে ফুলের

চারিদিকে, মাছেরা ঘোরে জলবালার চারিদিকে, তারার দল ঘোরে চাঁদের চারিদিকে,—তেমনিভাবে তারাও কাজলরেখাকে প্রদক্ষিণ করে উড়তে থাকে।

এইভাবে দিন যায়।

ক্রমে মেয়েরা বড় হয়ে উঠলেন। একদিন রাজবাড়ির বৃদ্ধ কঞ্চুকী রাজাকে বললেন,—কন্যাদের এইবার বিবাহের কাল হয়েছে। মহারানী নাই, থাকলে তিনিই রাজাধিরাজকে এ কথা বলতেন। তাঁর অভাবে কর্তব্য আমার, আমিই আপনাকে মনে করিয়ে দিচ্ছি।

রাজা সচেতন হয়ে উঠলেন। মনে মনে হিসাব করে দেখলেন, হ্যাঁ তাই তো, মুক্তামালার বয়স হল আঠারো, আর কাজলরেখার ষোল।

তিনি ডাকলেন মেয়েদের। দেখলেন। চোখ জুড়িয়ে গেল। যেন সদ্য-ফোটা দুটি পদ্মফুল।

বড় মেয়ে প্রণাম করে বাপের বিছানার পাশে বসলেন। কাজলরেখা বাপকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের কাছে বসলেন।

রাজা ভ্রূকুঞ্চিত করে কাজলরেখাকে বললেন, -একি, তুমি মাটিতে বসলে কেন? উঠে বস।

কাজল বললেন,—বাবা, শাস্ত্রে আছে—পিতা দেবতা, তাঁর সঙ্গে সমাসনে বসা উচিত নয়, তাঁর পায়ের তলাতেই বসা কর্তব্য। আর আসন হিসাবে মৃত্তিকাই হল শ্রেষ্ঠ আসন। তবে, আপনি যখন আদেশ করেছেন, তখন তাই বসছি।

এই উত্তরে রাজা সন্তুষ্ট হলেন।

তারপর কন্যাদের পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে প্রশ্ন করলেন,—মা, তোমরা এইবার বড় হয়েছ। বিবাহের বয়স হয়েছে। বিবাহ দিতে হবে। কিন্তু পাত্র সন্ধান করবার পূর্বে আমি জানতে চাই, তোমাদের কার কিরূপ আকাঙ্ক্ষা, কে কেমন স্বামী প্রার্থনা কর।—মা মুক্তামালা, তুমি বড়, তুমিই বল আগে।

মুক্তামালা বললেন,—আমার আকাঙ্ক্ষা, আমার স্বামী হবেন

তিনি, যিনি শৌর্যে বীর্যে তেজস্বিতায় হবেন আপনার যোগ্য জামাতা। রূপে হবেন তিনি কন্দর্পের মত, বীর্যে হবেন তিনি ঝড়ের সদৃশ—পবন দেবতার মত।

রাজা হেসে কন্যার কথায় বাধা দিয়ে রহস্য করলেন, বললেন,—তাহলে তোমার ছেলের প্রকাণ্ড লেজ থাকবে, মা। কেননা, পবন-নন্দন হলেন হনুমান। পিঠের উপর লেজ তুলে দিয়ে 'জয় রাম' বলে এক লাফে সাগর ডিঙিয়েছিলেন। জান তো?

মুক্তামালা একটু লজ্জিত হলেন।

রাজা হেসে বললেন,—বল, বল।

মুক্তামালা বললেন,—তিনি বীর্যে পবনের মত হবেন এইজন্য যে, শত্রুকুল তাঁর বীরত্বের সম্মুখে বড়-বড় গাছের মত ভেঙে পড়বে। তেজে তিনি হবেন অগ্নির মত,—তাঁর রক্তচক্ষুর দৃষ্টির উত্তাপে যারা দুষ্ট যারা হবে তাঁর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ, তারা অগ্নির সম্মুখে তৃণের মত ম্লান হয়ে শুকিয়ে যাবে; তাতেও যারা সংযত না হবে, তারা সেই তেজে হবে ভস্মীভূত। তাঁকে হতে হবে খ্যাতিমান প্রাচীন রাজবংশের সন্তান। যেহেতু সকল গুণের আকরই হল বীজ,—অমৃতফলের বীজ হতে জন্মায় যে গাছ, সে গাছের ফল কখনও বিস্বাদ অথবা বিষাক্ত হয় না। সংসারে জন্মগুণই শ্রেষ্ঠ।

রাজা মুগ্ধ হয়ে গেলেন কন্যার কথা শুনে।—হ্যাঁ, তাঁর মত রাজাধিরাজের উপযুক্ত কন্যা! রাজকন্যার উপযুক্ত কথা বলেছে সে।

কন্যার মাথায় হাত দিয়ে বাপ আশীর্বাদ করলেন। বললেন,—তুমি ইন্দ্রাণীর মত ভাগ্য লাভ কর। তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি। তোমার মনোমত স্বামীই আমি অনুসন্ধান করব। পৃথিবীতে না পাই, দেবলোক, গন্ধর্বলোক পর্যন্ত অনুসন্ধান করে অবশ্যই নিয়ে আসব।

মুক্তামালার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

তারপর রাজা ছোট মেয়ের দিকে ফিরে হাসি মুখে, অত্যন্ত

আদরের সঙ্গে পিঠে হাত দিয়ে বললেন,—মা, এবার তুমি বল তোমার মনের কথা।

কাজলরেখা চুপ করে রইলেন। বাপকে নিজের বিয়ের কথা—বরের কথা বলতে লজ্জা হল তাঁর।

রাজা হেসে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন,—লজ্জা বোধ করছ? আচ্ছা, থাক। আমি বুঝেছি—তোমার দিদি যা বলেছেন, তাঁর যেমন আকাঙ্ক্ষা, তোমারও কল্পনা তাই, বক্তব্যও তোমার তাই।

কঞ্চুকী বিনয় করে বললেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ, মহারাজ, অন্য প্রকার বাসনা বা বক্তব্য থাকবে কেন? পর্বতের কন্যা হল নদী। নানা ধারায়, নানা দেশের মধ্য দিয়ে তারা স্বয়ংবর হবার জন্য ছুটে চলে। তাদের গুণও এক—দেশকে করে উর্বর, আর তাদের লক্ষ্যও এক—মহাসাগরে মিলিত হওয়াই তাদের একমাত্র কামনা। সুতরাং মা কাজলরেখার বক্তব্যও ঐ এক।

এবার কাজলরেখা ধীরে-ধীরে ঘাড় নেড়ে বললেন,—না।

রাজা বিস্মিত হলেন। বললেন,—তবে বল, শুনি তোমার কামনার কথা।

কাজলরেখা মৃদুস্বরে বললেন,—আমার যিনি স্বামী হবেন, তিনি যেন হন সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। তিনি রাজপুত্র হতে পারেন, আবার অতি সাধারণ, এমনকি দীন দরিদ্রের সন্তানও হতে পারেন। কান্তিতে তিনি কন্দর্পতুল্যও হতে পারেন, আবার মহর্ষি অষ্টাবক্রের মত রূপহীনও হতে পারেন। তিনি গুণে হবেন মহাজ্ঞানী। যেহেতু জ্ঞানই হল প্রশান্তির একমাত্র আকর, এবং যেহেতু অন্তরের প্রশান্তি ভস্মীভূত সৌম্যতা, সেইহেতু তিনি রূপহীন যদি হন, তবুও হবেন সৌম্যদর্শন এবং শান্তপ্রকৃতি। পুণ্যকর্মই হবে তাঁর অস্ত্র, ক্ষমাই হবে তাঁর ধর্ম। মানুষকে তিনি জয় করবেন না। মানুষের সেবায় তিনি তাদের সেবক হবেন, মানুষই তাঁকে স্বেচ্ছায় বরণ করবে বিজয়ী বলে। সাম্রাজ্য তিনি কামনা করবেন না, রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্যে তিনি মোহগ্রস্ত হবেন

না। সাম্রাজ্য উথলে উঠবে তাঁর পদক্ষেপে, রাজপ্রাসাদ কাঁদবে তাঁর পদধূলির জন্য। তাঁর রক্ষী থাকবে না কেউ, যেহেতু জীবনই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় নয় ; এবং সেইহেতুই তিনি হবেন মৃত্যুঞ্জয়। তিনি সামান্য ব্যক্তির মতই সর্বসাধারণের একজন হবেন, সেইহেতুই তিনি হবেন অসামান্য।

রাজা এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। তাঁর কন্যা হয়ে এ কী বলছে কাজলরেখা ! তার কথার মধ্যে সে বারবার রাজত্বকে তুচ্ছ করছে, রাজাকে হেয় করছে ! তিনি বাধা দিয়ে বললেন,—তোমার মস্তিষ্কের বোধহয় ঠিক নাই, কাজলরেখা। তাই বারবার তুমি অসম্ভব কথা বলছ। রাজপুত্রকে কামনা না করে সাধারণ মানুষকে বরণ করবার কথা বলছ।

কাজলরেখা বললেন,—সাধারণের মধ্যে থেকেই তিনি হবেন অসাধারণ।

রাজা বললেন,—সাধারণ কখনও অসাধারণ হয় না। মুক্তামালার কথাই সত্য। বীজই সকল গুণের আকর। সুতরাং জন্ম যার উত্তম কুলে নয়, সে কখনও মহৎ বা শ্রেষ্ঠ বা অসাধারণ হতে পারে না।

কাজলরেখা বললেন,—কন্যার ঔদ্ধত্য মার্জনা করবেন। আমি কিন্তু মনে করি অন্যরূপ। জন্ম থেকেও কর্মকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। কর্ম থেকেই মানুষের প্রতিষ্ঠা, মানুষের প্রতিষ্ঠা থেকেই হয় একটি বংশের প্রতিষ্ঠা। আবার সেই বংশের বংশধরের অপকর্মে হয় সেই বংশের অধঃপতন। আপনার এই মহৎ বংশ—এই বংশের মহিমা এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করছে পুণ্যকর্মী উত্তরাধিকারীর উপর। উদ্ধত উগ্র ক্ষমাহীন প্রেমহীন উত্তরাধিকারী আপন দৌহিত্র—হোক না কেন মাতৃকুলের দিকে তার আপনার বংশে জন্ম, হোক না কেন পিতার দিক থেকে অন্য কোন বড় রাজবংশে জন্ম, সে কখনও আপনার বংশমহিমা এবং কুলগরিমাকে অক্ষুণ্ণ অটুট রাখতে পারবে না। বিধাতার লিপিও খণ্ডিত হয় মানুষের কর্মফলে, সুতরাং আপনার ইচ্ছা

এবং আশীর্বাদই আপনার উত্তরাধিকারীকে ভাবীকালে রক্ষা করতে পারবে না।

এই কথায় রাজা অত্যন্ত রুষ্ট হলেন কাজলরেখার উপর। কেন-না তাঁর মনে হল কাজলরেখা তাঁকে অপমান করেছে। রাজার পুত্রকে কামনা না করে সাধারণ মানুষকে কামনা করে সে বংশের অপমান করেছে। তাঁর আশীর্বাদ, তাঁর ইচ্ছা তাঁর উত্তরাধিকারীকে রক্ষা করতে পারবে না বলে, সে তাঁকে অপমান করেছে।

একবার তাঁর ইচ্ছা হল, প্রহরীকে ডেকে এখনই এই হীনমতি কন্যাকে বন্দিনী করে কারাগারে পাঠিয়ে দেন।

তারপর একটা কথা তাঁর বিদ্যুতের মত মাথায় খেলে গেল। ভাল, তাই হবে। কাজলরেখা রাজাকে উপেক্ষা করে; সাধারণ মানুষকে বিবাহ করতে তার প্রবৃত্তি। তাই তিনি করবেন। সেই বিবাহই হবে তার উপযুক্ত শাস্তি। রাজকন্যা হয়ে সে গরিবের বৌ হবে। দাস থাকবে না, দাসী থাকবে না, রাজভোগ পাবে না, মোটা কাপড় পরবে, নিজে ভাত রাঁধবে, ঘুঁটে দেবে, নিজের হাতে ঝাঁটা ধরবে—এই তো উপযুক্ত শাস্তি!

তিনি তাই স্থির করে দুই কন্যার পাত্র সন্ধান করতে লাগলেন। মুক্তামালার বর খুঁজতে চারিদিকে রাজ্যে রাজ্যে রাজ-ঘটক গেল; আর গরিবদের ঘটকালি করে যারা, তাদের কয়েকজনকে ডেকে কাজলরেখার পাত্র সন্ধান করতে বললেন।

এই ঘটকদের মধ্যে এক বৃদ্ধ, তিনি বললেন,—যদি অনুমতি করেন, তবে ছোট কন্যার মুখ থেকে একবার তাঁর কথা শুনতে চাই।

রাজা অনুমতি দিলেন। বুড়ো ঘটক রাজকন্যাকে বললেন,—মা, কয়েকটি প্রশ্ন করব। মহাদেবের বয়সের গাছপাথর ছিল না—জান তো? তিনি শ্মশানে বাস করেন—জান তো? দেবতারা যখন অমৃত পান করেন, তখন তিনি বিষ পান করেন—জান তো?

দক্ষ-রাজার কন্যা তাঁকে বিবাহ করার ফলে দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল—জান তো ?

কাজলরেখা বললেন,—জানি।

বৃদ্ধ বললেন,—তবে ?

—তবে ? কাজলরেখা বললেন,—বৃদ্ধ, আমি সতী কন্যা, আমার সঙ্কল্প কখনও ভঙ্গ হয় না।

—হ্যাঁ। বুঝলাম। তুমি সমস্ত কিছু সহ্য করতে প্রস্তুত।

—নিশ্চয় !

তারপর রাজ্যে এক মহা উৎসব আরম্ভ হল। মুক্তামালার বিবাহ। মহা সমারোহ করে মুক্তামালার বিয়ে হল এক রাজপুত্রের সঙ্গে। যেমন বর চেয়েছিলেন মুক্তমালা, তেমনি বর।

আর কাজলরেখা ?

হ্যাঁ। তারপর একদিন সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঘটক নিয়ে এল এক বর। সাধারণ একটি লোক। এক দেশের এক কবি। গরিব, কিন্তু খুব পণ্ডিত। দেখতে মোটেই সুন্দর নন, কিন্তু মুখের হাসিটি বড শান্ত। দেখলেও মানুষ শান্তি পায়।

রাজা কন্যাদান করবার সময়ে ভেবেছিলেন মুখ ঘুরিয়ে থাকবেন, মুখ দেখবেন না।

হঠাৎ একবার দৃষ্টি পড়ল ছেলেটির মুখের দিকে। তার মুখের হাসিটি বড় ভাল লাগল। তিনি একবার ভাল করে দেখলেন। আবার দেখলেন। কন্যাদান শেষ করে উঠে একবার ভাবলেন, তাদের ডেকে ধনরত্ন দিয়ে তাদের আদর করে নিজের কাছেই রাখবেন। কিন্তু না। নিজেকে কঠোর করে তুললেন। কর্তব্য করতেই হবে। মুখ ঘুরিয়ে বললেন,—আজই রাত্রে তোমরা আমার রাজ্য থেকে চলে যাও। প্রভাতে যেন দেখতে না পাই। কেউ যেন জানতে না পারে।

কাজলরেখার বিয়ের কথা কাউকে জানান নি তিনি। আলো জ্বলে নাই, বাজনা বাজে নাই, শুধু দু-বার চারবার শাঁখ বেজেছিল। দুটি প্রদীপ জ্বলেছিল, তাও ঘর বন্ধ করে।

অন্ধকারের মধ্যে বর আর কনে—কবি আর কাজলরেখা হাত-ধরাধরি করে, পায়ে হেঁটে, রাজ্য থেকে চলে গেলেন। যাবার সময় রাজা কিছু ধনরত্ন দিতে চাইলেন জামাইকে। জামাই বললেন,—আমাকে ওসবের বদলে কিছু চাল দিন, যা রান্না করে দশজনকে ভোজন করিয়ে, অবশিষ্টাংশ আমরা ভোজন করে তৃপ্তি পাব। ধনরত্ন অলঙ্কার—এর মূল্য আমি বুঝি না।

কন্যা কাজলরেখা তাঁর গায়ের সমস্ত অলঙ্কার খুলে বাপের পায়ের কাছে নামিয়ে দিলেন।

তারপর কবি আর কাজলরেখা এলেন কবির ঘরে।

গরিবের ঘর। কাজলরেখার তাতে কোন দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। প্রসন্ন মনে সমস্ত করেন, ঝাঁট দেওয়া থেকে রান্নাবান্না, বিছানা পাতা, জল আনা—সমস্ত।

কবি কাব্য লেখেন। রাত্রে কাজলরেখাকে শোনান। কাব্যে কবি ভগবানকে স্তব করেন, প্রার্থনা করেন—হে ভগবান, তুমি মঙ্গলময়, তুমি দীন দরিদ্রের বন্ধু, তাদের দুঃখ তুমি দূর কর। সকল বিপদে তুমি তাদের রক্ষা কর। তাদের বড় কষ্ট, তুমি তাদের দিকে তাকাও।

শুনতে শুনতে কাজলরেখার চোখ জলে ভরে ওঠে।

কবি সকালে বার হন একতারা নিয়ে। গ্রামের পথে-পথে গান গেয়ে চলেন,—ধনী, তুমি অহঙ্কার কোরো না, ধনসম্পদ হল পদ্মপত্রের জল। দরিদ্র, তুমি দারিদ্র্য-দুঃখে পরের হিংসা কোরো না, অসৎ উপায়ে উপার্জনের চেষ্টা কোরো না; হিংসা হল নিজের কাপড়ে ধরানো আগুন, তাতে তুমিই পুড়ে মরবে। অসৎ উপায়ে উপার্জন

করা হল পাপ,—পাপ তোমাকে ধ্বংস করবে। উপরের দিকে চাও, যেখানে আছেন সকল মানুষের পরম বন্ধু এবং সকল রাজার রাজা; তিনি তোমাদের রক্ষা করবার জন্য, তোমাদের দুঃখকষ্ট দূর করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে বসে আছেন, সকল অবিচারের বিচার করবার জন্য ন্যায়দণ্ড নিয়ে অপেক্ষা করছেন। তাঁর দ্বারস্থ না হলে তিনি কী করবেন? তাঁর শরণ নাও, তাঁর শরণ নাও, তোমরা সকলে তাঁর শরণ নাও!

এদিকে রাজা মুক্তামালার বরকে তাঁর প্রতিনিধি করে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। মুক্তামালার বর মহা বীর, মহা যোদ্ধা; তিনি মৃগয়ায় যান, পশুপক্ষী বধ করেন, সৈন্যসামন্ত নিয়ে দেশ জয় করেন। রাজাদের বন্দী করে এনে দাস করেন, রানী আর রাজকন্যাদের এনে মুক্তামালার দাসী করে দেন।

আবার, তিনি কঠোর শাসক। সামান্য দোষও কেউ করলে তার নিষ্কৃতি নাই। চারিদিকে গুপ্তচর নিযুক্ত করেছেন। কে কোথায় রাজার নিন্দা করছে, সন্ধান রাখে গুপ্তচরেরা। কে কোথায় রাজার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করছে, সে-সন্ধান রাখে তারা। জামাই-রাজা কঠোর শাস্তি দেন।

প্রজারা সভয়ে সশঙ্কিত হয়ে দিন যাপন করে। কার কোন্‌দিন কী হয়! শস্য উঠলে সর্বাগ্রে রাজার কর আদায় দেয়, শস্য যদি নাও হয় তবুও ঋণ করে অথবা কিছু বিক্রি করে যেমন করেই হোক, রাজার কর দিয়ে আসে।

ক্রমে দুই কন্যারই দুটি ছেলে হল। ছেলেদুটি আপন-আপন বাপ-মায়ের কাছে বড় হতে লাগল।

মুক্তামালার ছেলে, ভবিষ্যৎ রাজা, রাজপ্রাসাদে সোনার ভাঁটা নিয়ে খেলা করে। তীর ধনুক নিয়ে পোষা-পাখি বিঁধে লক্ষ্যভেদ শেখে।

আর কাজলরেখার ছেলে ভোরে উঠে জোড়হাত করে বসে, কাজলরেখার সঙ্গে তার বাপের রচনা-করা ভগবানের স্তব গান করে, আঙিনায় খেলা করে, পাথর নুড়ি কুড়িয়ে আনে। যেগুলো ময়লা, মাটি লেগে থাকে, সেগুলিকে বলে,—মা, এরা গরিব-দুঃখী, নয়? গায়ে ময়লাটি লেগে রয়েছে।

তাদের সে স্নান করায়। বলে,—এদের সেবা করছি। সন্ধ্যায় সে শাস্ত্র পড়ে বাপের কাছে—নানা শাস্ত্র।

এমন সময়, সেবার একবার দেশে এল মহা হাহাকার। একেবারেই বৃষ্টি হল না। দারুণ অনাবৃষ্টি। বর্ষা না হলে শস্য হয় না, শস্য না হলেই দেশে হয় দুর্ভিক্ষ। দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হল। লোকে অন্নের অভাবে গাছের পাতা খেতে আরম্ভ করলে। স্ত্রী-পুত্র বেচতে আরম্ভ করলে।

জামাই-রাজার কঠোর শাসন। রাজকর আদায়ের জন্য নায়েব গোমস্তার সঙ্গে সৈন্যসামন্ত দেওয়া হল।

কাজলরেখার স্বামী কবি মানুষের দুঃখ দেখে অবিরাম কাঁদেন। ভগবানকে ডাকেন,—উপায় কর প্রভু, তুমি উপায় কর। মানুষকে তুমি রক্ষা কর।

কাজলরেখা জোড় হাত করে বসে থাকেন স্বামীর পাশে। ছেলেটিও থাকে।

রাত্রে কবিকে স্বপ্নাদেশ হল। এক জ্যোতির্ময় দিব্যকান্তি পুরুষ এসে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন,—আমার প্রতিনিধি স্বরূপ দেশে রাজা রয়েছে। তুমি প্রজাদের সঙ্গে করে তাঁর দরবারে যাও—জানাও তাঁকে তোমাদের দুঃখের কথা। তিনি যদি প্রতিকার না করেন, তখন আমার কাছে নালিশ জানালে তার প্রতিকার আমি করব।

সকালে উঠেই কবি কাজলরেখাকে সব বললেন। বলে বললেন, —দেখ, তোমার দিদি মুক্তামালার স্বামীর যে প্রকৃতির কথা আমি

শুনেছি, তাতে ভগবানের অভিপ্রায় যে কী তা আমি বুঝতে পারছি না। তবু আমাকে যেতে হবে। সত্যপ্রিয় (ছেলের নাম সত্যপ্রিয়) তোমার কাছে রইল। আমি যদি না ফিরি তবে তার ভার তোমার উপর রইল।

তারপর তিনি দুঃখীদের নিয়ে রাজদরবারে গেলেন। যত যান, তত দলে-দলে লোক তাঁর পাশে জমা হয়। এমনিভাবে তারা প্রাসাদের সম্মুখে গিয়ে জোড়হাত করে ডাকল,—হে মহারাজ! আমাদের দয়া করুন, আমাদের অন্ন দিন!

মুক্তামালার স্বামী ঘুমোচ্ছিলেন।

চিৎকারে তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। তিনি বেরিয়ে এলেন বারান্দায় রক্তচক্ষু হয়ে ক্রোধে কাঁপতে-কাঁপতে। বিছানা থেকে তরবারি হাতে নিতেই কিন্তু চিৎকার স্তব্ধ হয়ে গেল। তিনি বুঝলেন, সম্ভবত তারা তাঁর তরবারি হাতে নেওয়া জানতে পেরেছে। কিন্তু তিনি বারান্দায় এসে দেখলেন, শক্তিপ্রিয় (তাঁর ছেলের নাম শক্তিপ্রিয়)— তারই ভয়ে প্রজাদের চিৎকার স্তব্ধ হয়ে গেছে। শক্তিপ্রিয় ধনুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে বুক ফুলিয়ে, আর নিচে প্রজাদের সামনে, সর্বাগ্রে একটি মানুষের দেহ পড়ে আছে। তার বুকে একটা তীর বসে রয়েছে। দেখেই ছেলেকে তিনি মহা গৌরবের সঙ্গে বুকে তুলে নিলেন। উপযুক্ত পুত্র! উদ্ধত প্রজার বিদ্রোহ দমন করতে সে পারবে।

এদিকে খবর পেয়ে মাতাপুত্রে হাতজোড় করে ভগবানকে ডাকলেন। বললেন,—প্রভু, তোমার আদেশে সে গিয়েছিল; তাকে রাজা বধ করেছে। তার প্রতিহিংসা আমরা চাই না। আমরা চাই, তুমি বলেছিলে রাজা প্রতিকার না করলে তখন তোমার কাছে নালিশ জানাতে। রাজা প্রতিকার করে নাই। তুমি এইবার প্রতিকার কর, দুঃখীদের বাঁচাও, ত্রাণ কর!

এইবার ভগবানের আসন টলে উঠল। তিনি ডাকলেন ক্ষোভকে। বায়ুর মধ্যে যে ক্ষোভ থাকে, সে এল। বললে,—আমার অন্তরের

সকল রস যখন সূর্য হরণ করে তখন আমি জেগে উঠি। বাতাসকে করে তুলি ঝড়। মেঘ আসে আমার সঙ্গে—সে সূর্যকে ঢেকে ফেলে। জলের মধ্যে যে ক্ষোভ থাকে সে এল। বললে,—ঝড় যখন আমাকে আঘাত করে তখন তাকে প্রতিহত করবার জন্য আমি জাগি সমুদ্রের তরল তরঙ্গে। মাটির মধ্যে থাকে যে ক্ষোভ, সেও এল। সে বললে, মৃত্তিকাকে যখন উত্তপ্ত করে তোলে, আর যখন সহ্য হয় না, তখন আমি জাগি। আমার সঞ্চরণে মাটি তখন কাঁপে ভূমিকম্পে।

ভগবান বললেন,—তোমাদেরই আমি চাই। অন্যায়ের ঔদ্ধত্যের প্রতিকারের জন্যই তোমরা সৃষ্ট হয়েছ। ঈর্ষার অন্যায় তোমাদের মধ্যে নাই।

—যাও, তোমরা গিয়ে প্রজাদের বুকের মধ্যে অধিষ্ঠিত হও, দাউদাউ করে জ্বলে ওঠ; তারা মৃত্যুকেও তুচ্ছ করতে পারে, এমন ভাবে তাদের ক্ষুব্ধ করে তোল।

ক্ষোভ এল। অনাহারে মানুষ পাগল হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিল পেটের জ্বালায়। অপমান-বোধ ছিল না, অধিকার-বোধ ছিল না। পশুর মত উচ্ছিষ্ট খুঁজে, অখাদ্য খুঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ধনীর দুয়ারে, নগরের পথে-পথে বনে-প্রান্তরে পথেই পড়ে তারা মরছিল। সেই-সব মড়ার মাংস খাচ্ছিল অপর সকলে। তাদের অন্তরে ক্ষোভ এসে জাগল। মনের মধ্যে প্রশ্ন উদিত হল, কেন আমরা এমনভাবে না-খেয়ে মরব?

উত্তর দিলে সত্যপ্রিয়—বললে,—প্রশ্ন কর রাজাকে, যিনি প্রজাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নিয়েছেন, যিনি এর জন্য কর নিয়ে থাকেন।

দলে-দলে মানুষ এসে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এক বিরাট জনসমুদ্রের সৃষ্টি করলে। তারা দেখতে-দেখতে অন্যরকম হয়ে উঠল। দক্ষযজ্ঞের সময় শিবের জটা থেকে জন্ম নিয়েছিলেন বিরূপাক্ষ, তেমনই মূর্তি হল তাদের। তারা ছুটল দলে-দলে, মার-মার শব্দে—মার, ঐ

রাজাকে মার! রাজার পাপেই হয় অনাবৃষ্টি, রাজার পাপেই হয় দুর্ভিক্ষ, রাজার অত্যাচারেই আমাদের এই দশা! রাজাকে মার!

সত্যপ্রিয় পেছন পেছন ছুটল,—না না না! এরূপ নয়! এরূপ নয়! শান্ত হও। শান্ত হও। শান্ত, ধীর পদক্ষেপে চল। অশান্ত, অধীর, হিংস্র হয়ে উঠো না তোমরা।

কিন্তু সে কথা তাদের কানে ঢুকল না। জনতার কোলাহলের মধ্যে তার কণ্ঠস্বর হারিয়ে গেল।

তারা ছুটে গিয়ে পড়ল দলে দলে, হাজারে হাজারে লাখে লাখে রাজধানীতে, রাজপ্রাসাদের উপর। সঙ্গে-সঙ্গে সৈন্যেরা ক্ষেপে উঠল, হাতি ক্ষেপে উঠল, ঘোড়া ক্ষেপে উঠল। আকাশে পাক দিয়ে ঘুরতে লাগল বাজপক্ষী, শকুনি, গৃধিনী; সে এক প্রলয়ের ব্যাপার! ভেঙে পড়ল রাজার সিংহদ্বার। ছিঁড়ে পড়ল ঝাড়-লণ্ঠন। দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগল কাঠের আসবাব। প্রজারা হুঙ্কার দিয়ে উঠতে লাগল। মুক্তামালার বর কিন্তু মহাবীর, শক্তিপ্রিয়ও বীর,—মুক্তামালাও যুদ্ধ করতে জানেন। তাঁরা পালালেন না, যুদ্ধ করতে এলেন। কিন্তু এত মানুষের কাছে তাঁরা কী করবেন! কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনজন লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে।

প্রজারা তাঁদের দেহ মাড়িয়ে এরপর ছুটল—কোথায় সে বুড়ো রাজা! এইবার তাকে আমরা বধ করব! কোথায় সে?

অথর্ব বৃদ্ধ রাজা বসে ছিলেন আপনার ঘরে। তিনি ইষ্ট স্মরণ করতে লাগলেন। কোলাহল এগিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু রাজা আশ্চর্য হলেন, হঠাৎ কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেল। বাঁশির আওয়াজের মত একটি মিষ্টি আওয়াজ তাঁর কানে এল—ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও! হিংসাকে সংবরণ কর!

বাঁশির আওয়াজ শুনে দংশনোদ্যত অজগর যেমন থমকে দাঁড়িয়ে যায়, পাগলা হাতি যেমন শান্ত হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি পাগল লোকেরা থেমে গেল। রাজার ঘরে এসে ঢুকল ষোল-সতের বৎসরের একটি

ছোট ছেলে, সে যেন কুমার কার্তিক! কিন্তু তার হাতে ধনুর্বাণ নাই, অঙ্গে রাজবেশ নাই। পিছনে-পিছনে এসে ঢুকলেন বিধবা কাজলরেখা।

—বাবা!

রাজা চমকে উঠলেন।—মা কাজলরেখা?

—হ্যাঁ বাবা। এই আপনার দৌহিত্র।

—জামাই?

—তাঁকে তো বধ করেছে শক্তিপ্রিয়!

রাজা কাঁদতে লাগলেন।

কাজলরেখা বললে,—বাবা, জন্ম থেকে শ্রেষ্ঠ হল কর্ম, তাই সেই কর্ম-পুণ্যবলে মানুষের সেবায় পুণ্য উন্মত্ত মানুষও আজ সত্যপ্রিয়ের অনুগত। সেই পুণ্যে আপনাকে আজ রক্ষা করতে পেরেছি, এই আমার মহা ভাগ্য।

রাজা উঠলেন। নিজের মাথার মুকুট খুলে পরিয়ে দিলেন সত্যপ্রিয়ের মাথায়।

প্রজারা জয়ধ্বনি করে উঠল। রাজা বললেন,—আমার রাজকোষ, রাজ-ভাণ্ডার তোমাদের খুলে দিলাম।

সত্যপ্রিয় মাথার মুকুট খুলে প্রজাদের পায়ের তলায় রেখে দিয়ে বললে,—এও তোমাদের।

বিচিত্র কাহিনী

বিচিত্র কাহিনী।

কালের পটভূমি সুদূর দ্বাপর কাল পর্যন্ত প্রসারিত। স্থানের পটভূমি রাঢ়-বঙ্গের নবগ্রাম থেকে কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রবাদ, প্রতিহিংসাপরায়ণ অশ্বত্থামা পঞ্চপাণ্ডব-ভ্রমে দ্রৌপদীর গর্ভজাত পঞ্চপাণ্ডবের পুত্রকে বধ করলে, শোকাতুরা দ্রৌপদীর ক্রন্দনে এবং পুত্রশোকে বিচলিত ভীম অশ্বত্থামাকে বধ করবার উদ্দেশ্যে তাঁকে অনুসরণ করলেন। অশ্বত্থামা নিক্ষেপ করলেন ব্রহ্মশির বাণ। অর্জুনও ভীম এবং নিজের পক্ষকে রক্ষা করবার জন্য নিক্ষেপ করলেন ব্রহ্মাস্ত্র। দুই দিব্য অস্ত্র আকাশে উঠে মুখোমুখি হয়ে অনল বর্ষণ করতে লাগল। পৃথিবী থর-থর করে উঠল কেঁপে। আকাশ থেকে দেবতা, যক্ষ, রক্ষ, কিন্নর—পৃথিবীর দিকদিগন্ত থেকে মুনি ঋষি চিৎকার করে উঠলেন, —অস্ত্র সংবরণ কর! অস্ত্র সংবরণ কর! সাধারণ মানুষ কীটপতঙ্গ জীবজন্তু লতাগুল্ম বনস্পতি ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করে উঠল। অর্জুন অস্ত্র সংবরণ করলেন, কিন্তু অশ্বত্থামার প্রাণপণ চেষ্টাতেও অস্ত্র ফিরল না, সংবৃত হল না। অশ্বত্থামা লজ্জিত হয়ে কাতরভাবে বললেন,—আমি ক্রোধান্ধ হয়ে কঠিন হিংসায় অস্ত্রত্যাগ করেছি। আমি হারিয়েছি ব্রহ্মজ্ঞান—ব্রহ্মশির অস্ত্র আমার হিংসায় হয়ে উঠেছে বৃত্রাসুরের মত আসুরী অস্ত্র। আমি কী করব!

অস্ত্র তখন আসুরী ক্রূরতায় ক্রূর। পঞ্চপাণ্ডবের সম্মুখে পার্থ-সারথি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ক্রূরতায় বক্র ব্রহ্মশির তখন শ্রীকৃষ্ণ-রক্ষিত

পাণ্ডবদের পরিত্যাগ করে প্রবেশ করল অভিমন্যুর বিধবা উত্তরার গর্ভে। তাঁর গর্ভে পাণ্ডব-বংশধর পরীক্ষিৎ। আর্তনাদ করে উঠলেন উত্তরা কঠিন যন্ত্রণায়; গর্ভস্থ ভ্রূণ কেঁদে উঠল। তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সূক্ষ্ম দেহে প্রবেশ করলেন তাঁর গর্ভে। ক্রূর ব্রহ্মশিরকে নিয়ে এলেন বের করে, নিক্ষেপ করলেন তাকে, অভিশাপ দিলেন,—তুমি ক্রূর কুটিল বিষাক্ত সরীসৃপে পরিণত হও।

অস্ত্র প্রশ্ন করলে,—কোন্ অপরাধে তুমি আমাকে এমন অভিশাপে অভিশপ্ত করলে? তুমি নররূপী নারায়ণ। আমার অপরাধ কী তাই তুমি আমাকে বল।

শ্রীকৃষ্ণ বললেন,—তুমি ব্রহ্মশির অস্ত্র, ব্রাহ্মণ-প্রতিভায় তুমি উদ্ভূত: অতি সূক্ষ্ম অথচ অমোঘ শক্তি, নীতিজ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তুমি সেই নীতিকে লঙ্ঘন করেছ। অশ্বত্থামা তোমাকে নিক্ষেপ করেছিলেন—পঞ্চপাণ্ডবের বিনাশার্থে। তুমি আমার শক্তিকে অতিক্রম করতে না পেরে, বক্রপথে কুটিল গতিতে পার্শ্বাপসরণ করে, অরক্ষিত নারী উত্তরার গর্ভস্থিত ভ্রূণকে হত্যা করে পাণ্ডববংশের উপর প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছিলে। তোমার মধ্যে ব্রাহ্মণ-প্রতিভার যদি বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট থাকে তবে অনায়াসেই তোমার অপরাধ উপলব্ধি করতে পারবে।

অস্ত্র বললে,—কৃষ্ণ, তুমি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংসের উৎস —মহাশক্তি মহামায়ার চৈতন্যস্বরূপ। অনাদ্যন্ত তমিস্রার মধ্যে তুমিই জ্যোতি, জীবনে তুমিই চেতনা চৈতন্য। জীবনমানসে তুমিই বুদ্ধি বোধি, তুমিই জ্ঞান, তুমিই প্রজ্ঞা; তুমিই ন্যায়, তুমিই নীতি। এই বিরাট ধ্বংস-যজ্ঞে তুমি নির্বিকার নিরপেক্ষরূপে অবস্থান করছ। পাপ-পঙ্ককে ধ্বংস করতে, পুণ্যাত্মাকে প্রতিষ্ঠা করতে এ মহামারণে সারথ্য করেছ। তুমি নিজে বিবেচনা করে বল—এই ধ্বংসযজ্ঞ কি হিংসার প্রভাবকে দূরে রাখতে পেরেছে? এই যে ধর্মক্ষেত্র কুরু-ক্ষেত্রের মৃত্তিকা, সে কি রক্তসিক্ত হয়ে বর্ণে ও গন্ধের দ্বারা, শবাকীর্ণ

দৃশ্যের দ্বারা হিংসার প্রভাবকে ব্যক্ত করছে না? তুমি কি নিজে ভীষ্মের শরনিকরে জর্জরিত হয়ে, ক্রুদ্ধ হয়ে চক্রধারণ কর নি? সে ক্রোধ কি হিংসার দ্বারা প্রভাবিত হয় নি?

চকিত হলেন শ্রীকৃষ্ণ।

ঠিক এই মুহূর্তে শোনা গেল, কুরুশিবির থেকে নির্গত ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী, শত-পুত্রবধূ এবং বহুশত পৌত্রবধূদের বিলাপ-ধ্বনি। তাঁরা আসছেন রণক্ষেত্রে, মৃত প্রিয়জনের সন্ধানে।

নতমস্তক হলেন পাণ্ডবেরা—শঙ্কিত হলেন, চঞ্চল হলেন।

শ্রীকৃষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন একটি এবং ধীর স্থির নির্বিকার হয়ে সর্বাগ্রে দণ্ডায়মান হলেন।

গান্ধারী এসে অভিসম্পাত দিলেন। পাণ্ডবদের দিলেন না, দিলেন নররূপী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণকে। অভিসম্পাত দিলেন,—তুমি যেমন পাণ্ডবদের জ্ঞাতি-বিনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন করেছ, নির্বিকারত্ব অবলম্বন করেও সারথ্য-কর্ম করে প্রকারান্তরে প্রশ্রয় দিয়েছ—তেমনি তোমার জ্ঞাতিবর্গও তোমার দ্বারাই বিনষ্ট হবে। তারপর তুমি নিজেও নিহত হবে; অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুত্রহীন হয়ে বনচারী হতে হবে তোমাকে। সেই অবস্থায় নিষ্ঠুরভাবে কুটিল উপায়ে নিহত হবে তুমি।

শ্রীকৃষ্ণ একবার সেই বহুদূরে নিক্ষিপ্ত অভিশাপগ্রস্ত ব্রহ্মশির অস্ত্রের পথের দিকে চাইলেন। সে অস্ত্র তখন বহু—বহু দূরে হেমন্ত-রাত্রির কক্ষচ্যুত উল্কার মত প্রচণ্ড বেগে ধাবিত। লোকচক্ষু হতে অদৃশ্য। ভগবান কৃষ্ণ মনে-মনে বললেন,—তিষ্ঠ।

সেইখানেই তখন সেই অস্ত্র এক মহাবিষধর ভুজঙ্গের আকার ধারণ করে পতিত হল।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবী গান্ধারীর দিকে চেয়ে সহাস্যমুখেই বললেন,—দেবী, আমার কর্তব্য আপনি নির্ধারিত করে দিলেন। বললেন,—আপনার বাণী অমোঘ। আপনার মধ্যে এই মুহূর্তে আমি সেই

মহাশক্তিকে প্রতিভাত দেখছি। যিনি সূর্যের জ্যোতির পরিধিকে বেষ্টন করে তমসারূপে অবস্থান করেন—একদিকে জ্যোতিকে সমধিক রূপে বিকশিত করেন অন্যদিকে যিনি প্রতিমুহূর্তে সূর্যকে গ্রাসে সমুদ্যত রয়েছেন, তিনিই আপনার মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন। সুতরাং এ অভিশাপ অভিশাপ নয়—মহাশক্তির অলঙ্ঘনীয় নির্দেশ। জীবন-চৈতন্যের নূতন উদয়ের জন্য কুটিল চক্রান্তে আমার জীবনাবসান একটি কালের দিনান্ত।

* * *

এখানে প্রবাদ ঐ ব্রহ্মশির-অস্ত্রের নাগ-জীবন ও শাপমোচন নিয়ে।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন 'তিষ্ঠ' বলেছিলেন তখন মহাস্ত্র নাগরূপে রূপান্তরিত হতে-হতে শূন্যপথে এই মহানাগের মাঠের উপর দিয়ে চলেছিল। ভগবান 'তিষ্ঠ' বলতেই মহাস্ত্র ব্রহ্মশির মহাবিষধর নাগরূপ পেয়ে এই মাঠের বুকে পড়ল। মাঠটি ছিল শস্যশ্যামল, মধ্যে ছিল একটি কাজল-জল-টলমল দিঘি। মধ্যে-মধ্যে ছিল পল্লবঘন ফলবান বৃক্ষ। এখানে-ওখানে নানা বর্ণের ফুলে ভরা লতাগুল্ম ; গাছে-গাছে ঝাঁকে-ঝাঁকে পাখি ; গুল্মের চারিপাশে নানা বিচিত্র বর্ণের প্রজাপতি দেবলোক থেকে ছড়িয়ে-দেওয়া ফুলের পাপড়ির মত উড়ে বেড়াত। তখন এই মাঠের নাম ছিল অন্য—কেউ বলে অমরকুণ্ড, কেউ বলে শ্যামকুণ্ড, কেউ বলে অন্য কিছু।

ব্রহ্মশির নাগ হয়ে সেইখানে পড়েই ফণা তুলে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল এবং এই স্নিগ্ধ শ্যামল পরিবেশ দেখে অকারণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। এই নিশ্বাসে প্রথমেই পুড়ে ছাই হয়ে গেল প্রজাপতিগুলি ও পুষ্পসম্ভার, তারপর শুকাল গাছের পাতা, পুড়ে ছাই হল বিহঙ্গকুল. সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল মাঠের শস্য। তারপর শুকাল জল, ক্রমে ক্রমে এই মাঠখানা হয়ে গেল জলহীন, ধূসর, বিষ বাতাসে জর্জর মরুভূমি। আকাশে মেঘ ওঠে—মহানাগের মাঠের উপর সে-মেঘ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। শূন্যলোক দিয়ে কোন পাখি যদি

মহানাগের মাঠ অতিক্রম করতে যায়, মুহূর্তের মধ্যে সে-পাখির পাখা পুড়ে যায়—সে-পাখি পড়ে যায় মাটিতে। এই গণ্ডীর মধ্যে কোন স্থলচর প্রবেশ করবামাত্র বিষ-নিশ্বাসে জর্জরিত হয়ে পঙ্গু হয়ে যায়, নাগ তাকে বিষ-নিশ্বাসে আকর্ষণ করে; হিংস্র উল্লাসে দংশন করে তার উপর ফণা তুলে দাঁড়ায়। নাগ হল কালের প্রতীক। তার পরমায়ুর নাকি পরিমাণ নাই। তার উপর এই ব্রহ্মশির মহানাগ অভিশাপগ্রস্ত। সে শাপ মোচন না-হওয়া পর্যন্ত তার মৃত্যু হবে কেমন করে?

চলে গেল দ্বাপর। কলিযুগ এল। সে-যুগেরও পরে চলে গেল কত কাল। অকস্মাৎ একদিন···কিছুদিন আগেই বর্ষচক্র শেষ হয়ে নূতন বর্ষ আরম্ভ হয়েছে। তখন সূর্য মেষরাশিস্থ, গ্রামে গ্রামে ভগবান বিষ্ণুর চন্দনযাত্রা-পার্বণ চলেছে।

বৈশাখ মাস। তিথি পূর্ণিমা। মহানাগ পূর্ণচন্দ্রের শীতল রশ্মির দিকে ক্রূর দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। অকস্মাৎ একটা বাতাস উঠল। সেই বাতাসে যেন কিসের স্পর্শ। নাগের জর্জর দেহ শীতল হল যেন। সঙ্গে-সঙ্গে মনে হল, অতি ক্ষুদ্র একটি বিন্দুর আকারে কিছু এসে পড়ল সেখানে···বোধকরি তারই নিশ্বাসের আকর্ষণে। কিন্তু বস্তুটি পুড়ে ছাই হয়ে গেল না। নাগ ক্রুদ্ধ হল—তার অহঙ্কার আহত হল। কী এমন বস্তু, কী এমন শক্তি তার যে, ব্রহ্মশিরের নিশ্বাসেও তা পুড়ে ছাই হয়ে গেল না? মুহূর্তে ফণা তুলে সে দংশন করলে সেই বস্তুটিকে। ঢেলে দিলে তার বিষ।···যে বিষ কণ্ঠে ধারণ করে মৃত্যুঞ্জয়কেও বিবশ হতে হয়েছিল, সেই বিষ। আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য! বিষসিক্ত হয়েও সে-বস্তুটি পুড়ে গেল না। নাগ বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল সেই বস্তুটির দিকে। বস্তুটি একটি বাজ, কোন গাছের বীজ। ধীরে ধীরে নাগ চিনলে, এটি একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের বীজ। সে ক্রুদ্ধ হয়ে আবার তাতে বিষ ঢাললে। আশ্চর্য, বীজটি

সেই বিষরসসিক্ত হয়ে যেন পুষ্ট হয়ে উঠল। চন্দ্র তখন অস্ত-শিখরে লগ্ন হয়ে হরিদ্রাভ হয়ে উঠেছেন। আবার নাগ দংশনোদ্যত হল। তখন বীজটি বাঙ্মুখর হয়ে উঠল। বীজ কথা কইলে। বিস্ময়ে বিমূঢ় হল ব্রহ্মশির।

বীজ বললে,—মহানাগ, তোমার বিষে আমাকে তুমি দগ্ধ করতে পারবে না। কারণ অমৃতরসে আমি অভিষিক্ত। যে বৃক্ষে আমার জন্ম, তার বীজও ছিল অমৃতরসে অভিষিক্ত। তোমার বিষ-রস আমাকে অভিষিক্ত করবে না। আমাকে অঙ্কুরিত হতে সাহায্য কর।

ক্রুদ্ধতর হয়ে উঠল ব্রহ্মশির। সে গর্জন করে উঠল,—মিথ্যা কথা! বলেই সে আবার দংশন করলে…দংশনের পর দংশন। অতি ক্ষুদ্র সর্ষপাকার বীজ—দংশনের বেগে, ফণার আঘাতে মাটির মধ্যে হারিয়ে গেল…

মাটির মধ্য থেকে বীজের কথা শোনা গেল,—আমি অঙ্কুরিত হচ্ছি ব্রহ্মশির। যে বৃক্ষে আমার জন্ম, সে বৃক্ষের বীজ অভিষিক্ত হয়েছিল দ্বাপরের চৈতন্যপুরুষ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের অশ্রুবিন্দুতে এবং শরাহত তাঁর পদারবিন্দের শোণিতে।

—শ্রীকৃষ্ণের অশ্রুবিন্দুতে? তাঁর শোণিতে? মিথ্যা। মিথ্যা। আমি তাঁকে জানতাম। অশ্রু তাঁর চোখে অসম্ভব!

—অসম্ভব নয়। মিথ্যা নয়। পরম সত্য। দেবী গান্ধারীর অভিশাপে যদুবংশ ধ্বংস হল আত্মকলহে। বলদেব যোগাবলম্বনে দেহত্যাগ করলেন। ভগবান প্রবেশ করলেন অরণ্যে। একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের ছায়ায় ঘন গুল্মের অন্তরালে উপবেশন করলেন। গান্ধারীর অভিশাপে এক ব্যাধ তাঁর রাঙা পা-খানিকে হরিণের রক্তাভ জিহ্বা ভ্রম করে শরাঘাতে আহত করলে। ভগবান তখন লীলা-জীবনের কথা স্মরণ করছিলেন। শর এসে তাঁকে আঘাত করলে। তিনি সবলে উৎপাটিত করলেন সে শর। রক্ত উৎসারিত হল। সে রক্ত যেখানে পড়েছিল, সেখানে পড়ে ছিল একটি ফল, ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষের ফল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই শুনতে পেলেন ধরিত্রীর মৃদু ক্রন্দন। তিনি বুঝলেন—তাঁর বিরহ-কল্পনায় ধরিত্রী কাঁদছে। তখন তিনি আহ্বান করলেন ধরিত্রীকে।

ধরিত্রী এসে দাঁড়ালেন। পুরুষোত্তমের অবস্থা দেখে কাতর আর্তনাদে কেঁপে উঠলেন ধরিত্রী। বললেন,—কুরুক্ষেত্রের রক্তের জ্বালার দাহে আমার যন্ত্রণার আর শেষ নাই। পুরুষোত্তম, তুমি এর উপর তোমার রক্ত ঢেলে দিলে, এর দাবদাহ আমি সইব কী করে?

পুরুষোত্তমের মুখে স্মিত হাস্য—কিন্তু চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল দুটি অশ্রুবিন্দু। বললেন,—কল্যাণী, আমার রক্ত দিয়েই তোমার কুরুক্ষেত্রের দাহের উপর প্রলেপ দিলাম। এ ছিল অনিবার্য। দেবী গান্ধারীর শোকতপ্ত অন্তরের অন্তরাল থেকে আদি-শক্তির নির্দেশ। কল্যাণী, পাপীকে সংহার করে পাপকে বিনাশ করতে চেয়েছিলাম। বিরাট কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসলীলা। পাপাশ্রয়ী বহু মানুষ হত হয়েছে। কিন্তু পাপ? শেষে কি পাপ এসে আশ্রয় করলে আমার ঘরের মানুষদের, যদু বংশকে! সুরাপানে উন্মত্ত, বিলাসে সম্ভোগে পরস্পরে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে গৃহযুদ্ধে মত্ত হল—তারা বিনষ্ট হল। হিংসাকে উন্মত্ত উলঙ্গ মূর্তিতে প্রকট দেখে এসেছি প্রভাসের কূলে। তুমি অনুভব করতে পারছ না? তাঁর চোখ থেকে দু-ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। পড়ল হাতের সেই রক্তসিক্ত অশ্বত্থফলটির উপর।

ধরিত্রী বললেন,—পারছি। তবু সান্ত্বনা, পুরুষোত্তম আমার বুকে জীবন্ত বিগ্রহের রূপে অধিষ্ঠিত আছেন। এর পর আমার কী হবে বলতে পার?

পুরুষোত্তম বললেন,—তপস্যা কর। আমি তো কুরুক্ষেত্রে বলেছি, আবার আসব। প্রয়োজন হলে, সময় হলে, আহ্বান এলে যুগে-যুগে আমি এসেছি—আসব।

ধরিত্রী ম্লান হেসে বললেন,—আবার কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করবে প্রভু?

—জানি না, চৈতন্য নব কলেবরে কোন্ রূপ ধরবেন। তুমি তপস্যা আরম্ভ কর। তোমার অন্তরকামনাকে প্রকাশ কর।

লীলা সংবরণ করলেন দ্বাপর যুগের পুরুষোত্তম চৈতন্যস্বরূপ, মানব-জীবনের ভাববিগ্রহ। পড়ে রইল তাঁর সেই অশ্রু ও রক্তসিক্ত অশ্বত্থফলটি।

ধেয়ে এল সমুদ্র—বক্ষে ধারণ করবে পুরুষোত্তমের নশ্বর দেহ। সঙ্গে সঙ্গে উঠল ঝড়। সেই ঝড়ের বেগে ফলটি উঠল শূন্যমার্গে। এসে পড়ল বিষ্ণুপাদপদ্ম-মহিমায় মহিমান্বিত গয়াক্ষেত্রের কাছে। অঙ্কুরিত হল সেই বীজ। পরিণত হল মহাদ্রুমে। আজ এতকাল পরে অকস্মাৎ মহাদ্রুমের পল্লবে পত্রে শিহরণ জাগল। ফলে ফলে স্পন্দন উঠল। উল্লসিত হল মহাদ্রুম এক অজানিত উল্লাসে। বাতাস এল এক অভিনব গন্ধ বহন করে। মহাদ্রুম প্রশ্ন করলে বাতাসকে,—বাতাস, কোন্ গন্ধ তুমি নিয়ে এলে বহন করে? এ কিসের গন্ধ? কার গন্ধ?

বাতাস বললে,—এ এক নবজাতকের গাত্রগন্ধ। হিমাচলের পাদদেশে উদ্যানভূমিতে বৃক্ষচ্ছায়াতলে এক মহীয়সী নারী এক পুত্র প্রসব করেছেন। এ তারই গাত্রগন্ধ। মহাদ্রুম, সেই গন্ধে আমার অঙ্গে অঙ্গে জাগল অপরূপ আনন্দ-উল্লাস। সেই উল্লাসে আমি চঞ্চল হয়ে হলাম প্রবাহিত। এবং সঙ্গে-সঙ্গে কোন্ এক আকর্ষণে ধাবিত হয়ে এলাম এই অভিমুখে। হে দ্রুম, তুমিই কি আমাকে আকর্ষণ করেছ?

মহাদ্রুমের পল্লব-পত্রের মর্মরধ্বনিতে এক মহাসঙ্গীত জেগে উঠল। কাণ্ডে কাণ্ডে আন্দোলন জাগল। ফল বৃক্ষচ্যুত হয়ে ফাটল, আমি বীজ, বাতাসে ভাসলাম। মহানন্দে ভেসে চলেছিলাম, আকৃষ্ট হলাম তোমার আকর্ষণে। পড়লাম এখানে। হে নাগ, আমার সর্বাঙ্গে অমৃতের শক্তি। তোমার বিষে আমার ধ্বংস হবে না। আমি অঙ্কুরিত হচ্ছি। আমার মনে হচ্ছে, কোন দৈব নির্দেশে তোমাকে ছায়া এবং

আশ্রয় দেবার জন্যই এখানে এসে পড়েছি। আমার জন্য তোমার কোন অনিষ্ট হবে না। আমি তোমার কল্যাণ করব। তোমাকে ছায়া দেব।

নাগ ক্রোধভরে তার উপর আবার বিষোদ্গার করলে।

* * * *

আশ্চর্য!

ব্রহ্মশিরের সেই বিষদগ্ধ প্রান্তরে যেখানে তৃণাঙ্কুর জন্মায় না, বর্ষণ হয় না, শূন্যমার্গেও কীটপতঙ্গ বিহঙ্গ যেতে পারে না, সেইখানে জন্মাল এক অশ্বত্থ বৃক্ষ। ব্রহ্মশির নাগ প্রত্যহ তাকে দংশন করে, তবু সে মরে না। পল্লব বিস্তার করে ছায়া ফেলে আহ্বান করে,—হে নাগ, আমার ছায়াতলে এসে আশ্রয় নাও। বিশ্রাম কর।

নাগ ঘৃণাভরে সে আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে।

অকস্মাৎ আবার এল পূর্ণিমা তিথি। অশ্বত্থ বৃক্ষ তখন তরুণ। তার তরুণ কাণ্ডে, শ্যামল কোমল পত্রপল্লবে জাগল অভূতপূর্ব আনন্দ-শিহরণ!

কী হল?

বাতাস বলে গেল—হিমাচলের পাদদেশে উদ্যানভূমিতে যে শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল, সেই শিশু বুদ্ধত্ব লাভ করলেন। নবযুগের পুরুষোত্তম চৈতন্যে প্রবুদ্ধ হয়ে, অশান্তি-জর্জর পাপতাপদগ্ধ পৃথিবীর বুকে মানুষের অন্তরলোকে অমৃত পরিবেশন করলেন। চৈতন্যের নবজন্মের সূচনা হল মানুষের জীবনে। হিংসা ক্রোধ থেকে উত্তরিত হবে মানবসমাজ অহিংসায়, অক্রোধে ও প্রেমে। তিনি বুদ্ধত্ব অর্জন করলেন সেই মহাদ্রুমের ছায়াতলে—যে মহাদ্রুমের বৃন্তাগ্রে তুমি, হে বৃক্ষ, বীজরূপে জন্ম লাভ করেছিলে। তাই আজ এই পূর্ণ তিথির পরমক্ষণে তোমার সর্বাঙ্গে জেগেছে এই মহোল্লাস! তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না, তোমার পল্লব পত্রমর্মরে জাগছে এক অপূর্ব সঙ্গীতের অস্পষ্ট আভাস?

সত্যই জাগছিল সেই সঙ্গীত।

সেই সঙ্গীতে স্তব্ধ হয়ে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে রইল মহানাগ। দংশনোদ্যত হয়েও সে যেন অবশ হয়ে গেল। দংশন করতে নিজের ফণাকে নিক্ষেপ করতে পারলে না।

সঙ্গীত থামল। তখন গর্জন করে উঠল মহানাগ।

এদিকে দিন-দিন ব্রাহ্মণ-সমাজে জাগল ক্রুদ্ধ কোলাহল—এ পাপ! এ অধর্ম! উদুখল মুষলে শস্যবীজ চূর্ণ করবার সময় ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণেরা বলতে লাগলেন,—নাস্তিক, ব্রহ্মণ্য-বিরোধী বুদ্ধের মস্তক চূর্ণ কর···মস্তক চূর্ণ কর!

নাগ ব্যঙ্গ-হাস্য হাসল। গর্জন করল। উপহাস করে বললে,—হে বৃক্ষ, ঐ শোন!

*   *   *   *

তার পর কতকাল চলে গেল।

কত পরিবর্তন। কখনও ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষের পল্লবে উল্লাস জাগে, কখনও শুষ্ক উত্তপ্ত প্রখরতায় ঝরে যায় পাতা। অশ্বত্থ দাঁড়িয়ে থাকে মৃত বনস্পতির মত। তাকে উপহাস করে মহানাগ। ক্রুদ্ধ বিক্রমে, প্রচণ্ড উল্লাসে সে গর্জন করে ফেরে। দগ্ধ করে মৃত্তিকা, দগ্ধ করে বায়ুস্তর। চারিদিকে জাগে বিভীষিকা। প্রশ্ন করে বনস্পতি অশ্বত্থকে,—কই কোথায় সেই অমৃত, কোথায় সে শান্তি?

বনস্পতি বলে,—আমি তো অনুভব করছি। তুমি কেন করছ না? কলিঙ্গবিজয়ী চণ্ডাশোকের কথা স্মরণ কর। অর্ধ-পৃথিবীব্যাপী ধর্মবিজয়ের গৌরব স্মরণ কর। মহারাজ হর্ষবর্ধনের কথা স্মরণ কর। এই তো—এই রাঢ়ভূমে মহারাজ ধর্মপালের স্মৃতি তো সদ্যস্মৃতি। এখনও তা বিস্মৃতপ্রায় অতীত কাহিনীতে পরিণত হয়নি। তোমার বিষদগ্ধ গণ্ডীর বাইরের মানুষের সমাজের দিকে তাকিয়ে দেখ।

অধিক কী—তোমাকে যিনি অভিশাপ দিয়েছিলেন তিনিই তো নব-চৈতন্যে এই সত্য স্বীকার করেছেন।

নাগ বলে,—মিথ্যা কথা! এ সে নয়।

বনস্পতি বলে,—এ সেই।

নাগ বলে,—জিজ্ঞাসা কর কোন ব্রাহ্মণকে। সেই তো জানে শাস্ত্রতত্ত্ব।

বনস্পতি বলে,—বাতাসে ভেসে আসে তাদের অতি গোপন বিশ্বাসের ফিস্‌ফিসানি—সে তুমি বুঝতে পার না। আমি পারি। তারা গোপনে তাই বলে। অন্তরে তাই বিশ্বাস করে।

—না, করে না।

—করে।

ব্যঙ্গ করে নাগ বলে,—কণ্ঠ উচ্চ কোরো না। এ কথা শুনতে পেলে সেন-রাজারা তোমার মূলোচ্ছেদ করে বিরাট কোন যজ্ঞানুষ্ঠানে তোমাকে পুড়িয়ে ভস্ম এবং অঙ্গারে পরিণত করবে।

তখন পালবংশের পতন ঘটেছে। রাজত্ব চলেছে সেনবংশের।

*　　　*　　　*

অকস্মাৎ একদিন। ঐ নাগের সাধের গণ্ডীর অনতিদূরবর্তী অজয় নদের জলস্রোতের কল্লোলধ্বনি আশ্চর্যরূপে সঙ্গীতময় হয়ে উঠল—

ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।

অশ্বত্থ বৃক্ষের পাতাগুলি থর-থর করে কাঁপতে লাগল সে-সঙ্গীতের ধ্বনিকম্পনে।

নাগও যেন কেমন ভাববিহ্বল হয়ে পড়ল।

বনস্পতি প্রশ্ন করলে,—কী হল? তোমার এমন ভাবান্তর কেন?

নাগ বললে,—বুঝতে পারছি না কী হল। বনস্পতি, কুরুক্ষেত্রে যেদিন পার্থসারথি আমাকে অভিশাপ দিয়ে নিক্ষেপ করেন এখানে—সেদিন পাঞ্চজন্য শঙ্খধ্বনি করেছিলেন। আজও অবধি আমি শুনি সেই শঙ্খের গর্জন। আজ যেন সেই ধ্বনির পরিবর্তে বাঁশির সুর

শুনতে পাচ্ছি। কী হল বুঝতে পারছি না। জ্ঞান বনস্পতি, স্বরূপে আমি ব্রাহ্মণ, প্রতিভায় মহাতেজোময় অস্ত্র। আমি যখন নিক্ষিপ্ত হয়ে প্রজ্বলিত হয়েছি—তখন বিশ্ব দগ্ধ হয়েছে, সমুদ্রে পড়লে সমুদ্র আবর্তিত হয়েছে আমার তেজে। তার উপর ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণ অশ্বত্থামার হিংসা আমাকে ক্রূর করে তুলেছে। শান্তি আমার পক্ষে অসহনীয়। সংসারে যা-কিছু মধুর তা আমার কাছে তিক্ত, বিষাক্ত মনে হয়। কিন্তু আজ যেন কী হয়ে গেল আমার! বনস্পতি, তুমি তো বাতাস থেকে বার্তা শুনতে পাও। কে এমন গাইছে বলতে পার?

কান পেতে শুনে অশ্বত্থ বললে,—অজয়তীরে কেন্দুবিল্ব গ্রামে কবিরাজ গোস্বামী রসশেখর কবি জয়দেব।

তারপর একদিন দেখা গেল ঐ বিষদগ্ধ প্রান্তরের গণ্ডীসীমায় একটি মানুষকে। সে যেন এই প্রান্তরের গণ্ডীর দিকেই এগিয়ে চলে আসছে।

অশ্বত্থ কম্পিত হয়ে পত্রপল্লব আন্দোলিত করে মর্মর-ভাষায় শঙ্কাভরে বললে,—তিষ্ঠ! থাম! আর অগ্রসর হয়ো না!

বিবর থেকে নাগ অনুভব করলে—মানুষ আসছে। ক্রুদ্ধ হয়ে ফণা তুলে সে বেরিয়ে এল। বিষ-নিশ্বাস ত্যাগ করে, নাগের মাঠের বায়ুস্তরে দাহিকা-শক্তি বিস্তার করে রক্তনেত্রে চেয়ে রইল।

মানুষটি তবু এগিয়ে আসছে। শুধু তাই নয়, সে গান গাইছে। স্তবগান:

প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদম্
বিহিতবহিত্র-চরিত্রমখেদম্
কেশব-ধৃত মীন শরীর
জয় জগদীশ হরে ॥

মূর্ছনা বিস্তার করলে সঙ্গীত সেই বিষদগ্ধ প্রান্তরের মধ্যে। বিষধর ব্রহ্মশির ফণা অবনত করে প্রণাম জানালে প্রলয়-পয়োধি-

পারাবারে জীবন-দেবতার প্রথম আবির্ভাবকে। মহাবিচিত্ররূপিণী মহাশক্তির প্রথম চৈতন্যোন্মেষকে।

তারপর ফণা তুলে বললে,—হে আগন্তুক, তিষ্ঠ! আর তুমি অগ্রসর হয়ো না। যেহেতু দেখছি তুমি ব্রাহ্মণ। বক্ষদেশে তোমার উপবীত দেখছি। কণ্ঠে তোমার চেতনাময় পুরুষের স্তবগান শুনছি এবং আমি আজ নাগদেহ প্রাপ্ত হলেও আমার উদ্ভব ব্রাহ্মণ-প্রতিভায় ব্রহ্মতেজোদ্ভূত আমি। অন্যথায় অন্য কোন জাতি হলে আমি তোমাকে বিষ-নিশ্বাসে দগ্ধ করতাম। আমি হিংসা দ্বারা আচ্ছন্ন অভিশাপে আমি বিষাক্ত। তুমি আর অগ্রসর হয়ো না। আমি আত্মসংবরণ করতে সক্ষম হব না। তুমি ফেরো। দাঁড়াও।

গায়ক ব্রাহ্মণ কিন্তু নিরস্ত হল না। গাইতে-গাইতে সে এগিয়ে আসতে লাগল:

ক্ষত্রিয় রুধিরময়ে জগদপগত-পাপম্
স্নপয়সি পয়সি শমিত ভব-তাপম্
কেশব-ধৃত ভৃগুপতিরূপ
জয় জগদীশ হরে॥

নাগ নিজের স্বভাবধর্মে আগন্তুকের উপর ভয়ঙ্কর আক্রোশ অনুভব করলে। চোখের দৃষ্টি কুটিল হয়ে উঠল। নিশ্বাস প্রখর হল দ্বিধাবিভক্ত জিহ্বা ঘন-ঘন প্রসারিত হতে লাগল। তার বিশাল ফণা প্রসারিত করে সে দংশনোদ্যত হয়ে দাঁড়াল, সগর্জনে পরিত্যাগ করলে ভয়ঙ্কর বিষ-নিশ্বাস। ব্রাহ্মণ গায়ক তবু নিরস্ত হল না। সে অগ্রসর হল। কণ্ঠে তার সেই স্তবগান:

—কেশব-ধৃত রামশরীর
জয় জগদীশ হরে॥

এবার নাগ ক্রুদ্ধ বিক্রমে ধাবমান হল। দংশন সে করবেই আর সে ক্ষমা করবে না।

ব্রাহ্মণ তখন সবে শেষ করেছে অষ্টম চৈতন্য-পুরুষের বন্দনা

ামীপবর্তী হল নাগ। ব্রাহ্মণ বললে,—দাঁড়াও হে মহানাগ, অভিশপ্ত ব্রহ্মশির! আমি তোমার কাছেই এসেছি। তোমার হিংসাকে তুমি সংবরণ কর।

নাগ বললে,—সংবরণ করা অসম্ভব। কারণ, আমার এই স্বভাবধর্ম। এতে আমার অধর্ম নাই। ব্যতিক্রমেই আমি নিন্দাভাজন; অপৌরুষ ও ভীরুতার অপবাদে আমার তেজোমহিমা অপযশগ্রস্ত হবে। যে চৈতন্যরূপী পুরুষের স্তবগান তুমি করছ, তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন না। তিনি ভৃগুপতিরূপে ক্ষত্রিয়দের ক্ষমা করেন নি। রামরূপে রাক্ষসদের বীর্যবলে সংহার করে অপরাধের শাস্তি দিয়েছেন। অষ্টম অবতারে কুরুক্ষেত্রে উদ্ধত দাম্ভিক ক্ষাত্রশক্তির বিনাশসাধন করেছেন। ব্রাহ্মণ, তুমি আমার নিষেধ অমান্য করে উদ্ধতভাবে আমার আবাসস্থলে প্রবেশ করেছ। তোমাকে দংশন করে শাস্তি দেওয়া আমার চৈতন্যময় পুরুষের নির্দেশ।

ব্রাহ্মণ বললে,—হে মহানাগ, চৈতন্যময় পুরুষ নব আবির্ভাবে বোধির নববিকাশে উত্তরণ করেছেন। হিংসা থেকে অহিংসার বহির্লোকের যজ্ঞকাণ্ড শেষ করে মর্তলোকে নূতন যজ্ঞ প্রজ্বলিত করেছেন:

নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়-হৃদয়-দর্শিত-পশুঘাতম্
কেশব-ধৃত বুদ্ধশরীর
জয় জগদীশ হরে॥

নাগ বক্রভাষায় তাকে নিন্দা করে বললে,—তুমি তাহলে ব্রাহ্মণ-ছদ্মবেশে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ! সেই নাস্তিক্যবাদী যজ্ঞকাণ্ড-বিরোধী বুদ্ধের শিষ্য? কে বললে বুদ্ধ চৈতন্যময় পুরুষ? ব্রাহ্মণেরা তাকে স্বীকার করে না।

ব্রাহ্মণ বললে,—করেছে। আমি নিজে ব্রাহ্মণ। এই গ্রামের অধিবাসী। কেন্দুবিল্ব চৈতন্যময় পুরুষের প্রসাদ-ধন্য, তাঁর কবি-

সত্তার অংশোদ্ভূত কবিরাজ গোস্বামী মহাকবি জয়দেব গোস্বামীর শিষ্য। বুদ্ধকে নবম চৈতন্যময় পুরুষ বলে উপলব্ধি করেই তিনি এই স্তোত্র রচনা করেছেন। তিনি বলেছেন,—এ উত্তরণে উত্তরিত হতে সাধারণ মানুষের কয়েক সহস্র বছর লাগবে। কিন্তু অন্তরে অন্তরে নবযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। কবিরাজ গোস্বামী আমাকে তোমার কাছেই প্রেরণ করেছেন। বলেছেন,—তোমার গ্রামের সান্নিধ্যে বিষদগ্ধ প্রান্তরে ব্রহ্মশির অগ্নিশাপগ্রস্ত হয়ে হিংস্র নাগরূপে অবস্থান করছে। তার শাপমোচনের কাল সমাগত। আমার এই স্তবগান রচনায় বুদ্ধকে উপলব্ধি করে, রাঢ়ের বুদ্ধি ও জ্ঞানবাদী ব্রাহ্মণ-সমাজ নব-চৈতন্যে উপনীত হতে চলেছে। পূর্ণ ও সম্যক উপলব্ধিতে বিলম্ব আছে। তবুও স্বীকৃতির লগ্নেই ব্রহ্মতেজোদ্ভূত ব্রহ্মশিরের শাপ মোচন হবে। তুমি গৃহপ্রত্যাবর্তনের পথে এই স্তবগান গেয়ে তার গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ কোরো। বুদ্ধের করুণা, অহিংসার শক্তি নাগের বিষ ও হিংসা থেকে তোমাকে রক্ষা করবে। হে নাগ, তুমি চৈতন্যময় পুরুষের নবজন্মের অহিংসা ও করুণার মহিমা উপলব্ধি কর—হিংসাকে সংযত কর। তাকে বিগলিত কর। অভিশাপ থেকে মুক্ত হও।

নাগ স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তার মনে হল তার সর্বাঙ্গে যেন অনির্বচনীয় প্রীতি ও শিহরণ বয়ে যাচ্ছে।

ব্রাহ্মণ বললে,—কুরুক্ষেত্রের রক্তপ্রবাহে ধরণীর বক্ষ দাবদাহে দগ্ধ হয়েছে। পাপীর বিনাশে পাপের বিনাশ হয়নি। পাপ মানব-মনের গভীরে আশ্রয় নিয়েছে। কুটিল কৌশল বিকৃত ন্যায়ের নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। চৈতন্যময় পুরুষ এবার তাই নবজন্মে নূতন সাধনায় পাপকে বিগলিত করতে উদ্যত হয়েছেন। তুমি গ্রহণ কর সেই সাধনা। প্রণাম কর চৈতন্যের নব মহিমাকে।

নাগের চোখ থেকে দুটি জলের ধারা নেমে এল। অশ্বত্থের পত্রপল্লবে মর্মরধ্বনির মধ্যে জাগল সেই বহু বৎসর পূর্বের পূর্ণিমা-তিথির সেই অনির্বচনীয় সঙ্গীত। অনতিদূরে অজয়ের জলকল্লোলে

সঙ্গীত-ঝঙ্কার ঝঙ্কৃত হল। উর্ধ্বে আকাশের নীল মহিমাকে আবৃত করে যে ধূলিস্তরের ধূসরতা সূর্যের তাপ-প্রখর হয়ে বহুকাল আবৃত করে রেখেছিল এই প্রান্তরকে, সে যেন ঘন শ্যামছায়ায় প্রসন্ন হল। শোনা গেল মহাকালের ডমরুধ্বনির মত গুরু-গুরু ধ্বনি। মেঘ উঠল প্রান্তরে। ঝর-ঝর হল বর্ষণ। ব্রাহ্মণ তারই মধ্যে গান গেয়ে চললেন।

তারপর কাটল মেঘ, উঠল সূর্য, প্রসন্ন কিরণে ঝলমল করে উঠল বহুকলের ধূলিধূসর প্রান্তর। অশ্বত্থবৃক্ষে দেখা দিল নূতন মুকুল। নাগ বললে,—আজ থেকে আমি নিজের বিষকে নিজে গ্রহণ করব। সেই তপস্যায় আমি আসন গ্রহণ করলাম এই বনস্পতির পাদদেশে। হে মহামহিমান্বিত মহাদ্রুমের বংশধর, আমার তপস্যায় তুমি আমার সহায় হও।

মুকুলিত বনস্পতি বললে,—তারই জন্যই তো আমার জন্ম এখানে।

তপস্যায় রত হল নাগ, বিষকে করলে সংহরণ। সে বিষে নিজে হতে লাগল জর্জরিত। ওদিকে চারিদিকে জাগতে লাগল তৃণাঙ্কুর। লোকে বিস্মিত হল। কী হল? নাগের কী হল? অবোধ তৃণাঙ্কুরলোভী পশু প্রশ্ন করলে। এগিয়ে এল। তৃণ ভোজন করে ফিরে গেল গ্রামে। মানুষ আরও বিস্মিত হল। আকাশপথে অবাধে উড়তে লাগল পাখির ঝাঁক। মানুষেরা এবার এগিয়ে এসে দেখলে—মহাভুজঙ্গমরূপী ব্রহ্মশির সমাধিমগ্ন অশ্বত্থতলে।

সংবাদ পেয়ে ছুটে এল এই গ্রামের অধিবাসী সেই কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য ব্রাহ্মণ গায়ক—পরমানন্দ ঠাকুর। সামবেদান্তর্গত কুথুমীশাকৈক ভারদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরস্য পরম বৈষ্ণব পরমানন্দ ঠাকুর। এসে দেখল,—সমবেত মানুষেরা সমাধিমগ্ন মহানাগের দেহ ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত জর্জরিত করে দিয়েছে। হাতের কাছে যে যা পেয়েছে তাই ছুঁড়ে আঘাত করছে। ব্রাহ্মণ হায় হায় করে উঠল। বললে,—করেছ কী তোমরা! ক্ষান্ত হও! ক্ষান্ত হও!

তারপর ডাকল,—মহানাগ ! ব্রহ্মশির !

নাগ এবার ধীরে ধীরে মাথা তুললে, বললে,—গুরু ! আমি হিংসাকে সংবরণ করেছি। চৈতন্যময় পুরুষের নূতন প্রকাশ-মহিমা উপলব্ধির পরমানন্দে আমি সকল আঘাত সহ্য করেছি। আমার মুক্তির সময় সমাগত। আমি অনুভব করছি, মুক্তি অদূরে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সে আসতে পারছে না আমার গুরুদক্ষিণার কাজ শেষ হয়নি বলে। তুমি আমার গুরু। তুমি আমাকে দীক্ষা দিয়েছ। আমার অধিকারের এই ভূমিখণ্ড তুমি দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ কর। আমার মুক্তি হোক।

ব্রাহ্মণ বললে,—তথাস্তু।

বলবামাত্র একটি দিব্য জ্যোতি সেই মহাভুজঙ্গের দেহ থেকে নির্গত হয়ে আকাশলোকে বিলান হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে বর্ষিত হতে লাগল অমৃতের মত জলধারা। মেঘগর্জনের মধ্যে ধ্বনিত হতে লাগল দশাবতার স্তোত্র :

—জয় জগদীশ হরে
কেশবধৃত মীনশরীর জয় জগদীশ হরে॥
কেশবধৃত বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে॥

———

জটায়ু

অস্বাভাবিক মৃত্যু বলেই পুলিশ এসে লাস নিয়ে জেলার সদরে চালান দেয়। সে লাস যায় জেলার বড় হাসপাতালে, সেখানে সিবিল সার্জনের তত্ত্বাবধানে লাস কেটে পরীক্ষা করে দেখা হয় মৃত্যু সঠিক কিসে বা কী কী কারণে ঘটেছে। সাপে কাটা, জলে ডোবা, গাছ থেকে পড়া, কি গাছ চাপা পড়া এইসব ধরনের মৃত্যুতে ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেণ্টরা নিঃসন্দেহ হয়ে সার্টিফিকেট দিয়ে সৎকারের হুকুম দিতে পারেন কিন্তু গলায় দড়ি থেকে খুনখারাপি পর্যন্ত ওতে তাঁদের হাত নেই। সে লাস চালান দিতেই হবে। কারণ কে বলতে পারে, বিষ খাইয়ে মেরে শেষ পর্যন্ত গলায় দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়নি। অস্ত্রাঘাতেও বোঝা যায়—আঘাতটা পরে করেছে, না নিজে করেছে অর্থাৎ, খুন না আত্মহত্যা। সেটা ডাক্তারেরা অস্ত্রাঘাতের ধরন দেখে বুঝতে পারেন।

কাজেই দুটো লাসই চালান দিলেন দারোগা।

জটে পাগল এবং কালী বা কালা গুণ্ডার লাস।

জটে পাগলার পাঁজরায় একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। কাঁধে হাতে আরও তিন-চারটে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। তবে, বুকের আঘাতটাতেই তার মৃত্যু ঘটেছে এতে কারুর সন্দেহ রইল না। কালা গুণ্ডার বড় ছোরাটাও রক্তমাখা অবস্থায় তার হাতের কাছে পড়ে ছিল। সুতরাং কালা গুণ্ডাই তাকে খুন করে থাকবে। কালা গুণ্ডা একটা অসুর, কালা গুণ্ডা একটা রাক্ষস, একটা দৈত্য—যা বল সে তাই।

তার পক্ষে একটা প্রৌঢ় পাগলকে খুন করা কী এমন ব্যাপার! খসখসে কালো রঙ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, তেমনি দাড়ি-গোঁফ, থ্যাবড়া নাক, ঠোঁটের উপর বেরিয়ে-পড়া দুটো বড় বড় দাঁতওয়ালা ছ-ফুট লম্বা কালা গুণ্ডা—এ অঞ্চলে ত্রাস বলে পরিগণিত ছিল। মায়েরা দুষ্টু ছেলেকে ভয় দেখাত—ঐ কালা গুণ্ডা আসছে! কালা গুণ্ডা নাহয় জটে পাগলকে খুন করলে, কিন্তু কালাকে কে মারলে? কালার গলায় একটা গভীর ক্ষতচিহ্ন। একপাশে চারটে, একপাশে পাঁচটা আঙুল গভীর ভাবে যেন ঢুকে গিয়েছিল। কেউ যেন নখ দিয়ে ওর গলাটা ছিঁড়ে দিতে চেয়েছিল। সে কি জটে পাগলা? হয়ত সে-ই। আর কে হবে? জটের আঙুলে বড়-বড় নখ প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা। নখে এবং আঙুলে রক্তও লেগে রয়েছে। তবুও বিশ্বাস হয় না।

কী করে হবে?

মনে পড়ছে যে, ১৯৪৭ সালে কালা গুণ্ডা প্রথম দিন এ-অঞ্চলে পা দিয়েই ত্রাসের সঞ্চার করেছিল।—চে—ৎ চ—ণ্ডী! চিৎকার করে ভাসতোড়ের এনতাজ মিয়ার বুকের কাছে চিমটেটা নিয়ে গিয়ে বলেছিল—জিভ বের কর মা—খেয়ে নে রক্ত! আশেপাশের লোক অনেক কষ্টে তাকে নিরস্ত করেছিল। এনতাজ মিয়া হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে বলেছিল—আমার ভুল হয়েছে। না—না, সে আপনি নয়।

ব্যাপারটা ঘটেছিল এই। সেদিন হঠাৎ কালার আবির্ভাব হল। পরনে গেরুয়া বহির্বাস ঘাড়ে ফের্তা দিয়ে বাঁধা, গলায় রুদ্রাক্ষ, তার ওপর একটা হলদে ব্যাগ, কাঁধে ঝোলা, হাতের চিমটে লোহার বালার সঙ্গে ঠুকে শব্দ তুলে এসে হাঁকল—আরে শুন হিন্দু, ব্রাহ্মণ আর চণ্ডাল—সব জাতি শুনো প্রভু বিশ্বনাথকে হুকুমৎ! লে আও চন্দা! চাঁদা আন! চাঁদা!

—চাঁদা!

—হাঁ। চাঁ—দা—হিন্দুকে বাঁচানে কে লিয়ে চন্দা—বাবা বিশ্বনাথকে হুকুমৎ। হিন্দুকে ধরম যাচ্ছে। পাঁচ হাজার—দশ

হাজার! কলকাত্তা-নোয়াখালি, জেনানীর ইজ্জত, হিন্দুর ধরম বাঁচানে কে লিয়ে চাঁদা। আড়াইশও রুপেয়া—লে আও।

ঠিক এই সময়েই সাউগা ভাসতোড়ের এনতাজ মিয়া ঐ পথ ধরেই যাচ্ছিল বায়েনপাড়া। এনতাজ চামড়ার ব্যবসা করে, দু-তিনটে জেলা ঘুরে চামড়া কিনে চালান দেয়—গতিবিধি তার সর্বত্র। সে কালাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বলেছিল,—আরে তুমিই না সেই ফকির!

—হাঁ, হম সন্ন্যাসী ফকির।

—না না, মুসলমান ফকির! মুর্শিদাবাদের শেখের পাড়াতে সেদিন—মুসলমানদের বাঁচাতে হবে পয়গম্বরের হুকুমৎ, কায়েদে আজমের ফরমান নিয়ে এসেছ তুমি—বলে চাঁদা তুলছিলে না? আর আজ এখানে এসেও হিন্দুকে বাঁচাতে হবে বলে—

সঙ্গে-সঙ্গে হুঙ্কার দিয়ে উঠল কালা গোঁসাই। তখনো তার গুণ্ডা খেতাব আবিষ্কৃত হয়নি। সে-হুঙ্কারে আশেপাশের লোকজন চমকে উঠল।

—কেয়া রে বিধর্মী! আমি মুসলমানের জন্য চাঁদা তুলি? আমি মুসলমান?

গলার রুদ্রাক্ষের মালাটা দেখিয়ে, চিমটেটা ঘোরাতে শুরু করে দিল—আ—আ! হে মহাদেব—বম্ বৈদ্যনাথ! কালী কালী মহাকালী—ভদ্রকালী কপালিনী অসুরনাশিনী! জিভ বের কর মা—খাও রক্ত, নাচ মা দিগম্বরী—হা—

সে এনতাজের মাথায় চিমটে বসায় আর কি! লোকজন ছুটে পালিয়েছিল—এনতাজ পালিয়েছিল তাদের সঙ্গে। কিন্তু কালা গোঁসাই তাতে মানে নি। শেষে এনতাজ বলেছিল—আমার ভুল হয়েছে গোঁসাই। না—না, সে তুমি নও।

গড়গড় করে গায়ত্রী মন্ত্র বলে গিয়ে কালা গোঁসাই বলেছিল—আমি মুসলমান? ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং। আমি

মুসলমান? জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী! আমি মুসলমান? খুন করব তোকে!

—আমি মাফ চাচ্ছি। আমার ভুল হয়েছে।

—হাঁ। মাফ তুম্‌কো নেহি করতা—লেকিন একটা সত্যি কথা বলেছিস—তাতেই তোকে মাফ কর্ দিয়া। শুনো—বেওকুফ হিন্দু লোক, গিধ্বড় বুড়বক ভেড়ীকে জাত, শুনো কেয়া বোলা ইয়ে শেখ। মুসলমানরা চাঁদা তুলছে। ফকির এসে চাঁদা তুলে ঘুরছে। পলটন তৈয়ার করেগা। হাঁ। হিন্দু ভেড়ী লোক—সমঝা লেও সোহি বাত—বিশ্বনাথজী সেই কথা বলে আমাকে পাঠিয়েছেন। বদ্রীনাথ আস্থানের ওপারে মহাবীরজীর—হনুমানজীর আশ্রম, হনুমানজী বলেছেন আমাকে,—যাও, চন্দা উঠাও। পার্বণ তৈয়ার কর। যো হিন্দু চন্দা নেহি দেগা—উ বরবাদ জায়েগা। ঘরে আগুন লাগবে, সাঁপে কাটবে। মাথা মে বজ্রাঘাত হোবে। হ্যাঁ। লেআও চন্দা। আড়াইশও রুপেয়া—ইয়ে গাঁও কা চন্দা।

এরপর চাঁদা না দিয়ে উপায় কী? চাঁদা এসেছিল—কিন্তু আড়াই শো নয়—পঞ্চাশ টাকা কয়েক আনা। কালা গোঁসাই বলেছিল,—আচ্ছা, কিস্তিতে শোধ করে নেব।

শুধু এ গাঁয়েই নয়, আশপাশ সকল হিন্দু গাঁয়েই চাঁদা তুলেছিল। সঙ্গে জনকয়েক চেলাও জুটেছিল। ঘোঁতনা হাজরা, লাটু চৌধুরী, গণ্ডার ঘোষ—তাদের সঙ্গে গাইয়ে গাঁজাল জগা পর্যন্ত।

ভারতবর্ষ তখন সদ্য-সদ্য ভাগ হয়েছে এবং স্বাধীন হয়েছে। নানা দিকে নানান গোলযোগ। ওদিকে পূর্বপাকিস্তান থেকে অনবরত লোক আসছে। লোকজন হৈ-হল্লা করছে। পুলিশের প্রতাপ কমেছে। তবুও একদিন এইসব খবর পেয়ে দারোগা এসে হাজির হল।

জিজ্ঞাসা করলে,—কী নাম?

—হম্ হ্যায় কালা গোঁসাহী।

—কালা গোঁসাহী ?

—হাঁ হাঁ। ভৈরব। কালভৈরব।

—বাড়ি কোথায় ?

—বাড়ি তো কৈলাস। আস্তানা কাশী।

—এসব কী বলে বেড়াচ্ছ ? আর, লোকজনের কাছে চাঁদা আদায় করছ কেন ?

—বিশ্বনাথ প্রভু, মহাবীরজী, কালভৈরবের হুকুম।

—ওসব চলবে না। চালান দেব আমি।

হা-হা করে হেসে উঠেছিল কালা গোঁসাই।—আরে, চালান দেগা ? বাঁধেগা ? কী দিয়ে বাঁধবে ? হাতকড়ি ? হা-হা-হা-হা ! থু-থু !

দারোগার আর সহ্য হয়নি। বলেছিল,—লাগাও হাতকড়ি।

হাত বাড়িয়ে কালা গোঁসাই বলেছিল—লাগাও।

কনস্টেবলটা ভয়ে-ভয়েই হাতকড়ি লাগিয়েছিল। লাগাবার পরমুহূর্তেই কালা গোঁসাই 'জয় কালী' বলে চেঁচিয়ে উঠে বন্দী হাত-দুটোয় একটা ঝটকা দিয়ে কী যে করলে লোকে ঠাওর পেলে না, কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখলে—একটা হাত থেকে হাতকড়ার বাঁধন খুলে গেছে ; হাতকড়াটা ঝুলছে একহাতে। মোট কথা, কালা গোঁসাইকে বাঁধা যায় নি। কিন্তু হাতকড়া খুললেই পুলিশের হাত থেকে খোলা পাওয়া যায় না। পুলিশ তাকে ওখানকার সবথেকে বড় গ্রাম নবগ্রামে ধরে নিয়ে গেল। স্থির করলে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ প্রচারের অপরাধে চালান দেবে। কিন্তু হাঙ্গামা হুজ্জুত অনেক,—সাক্ষী-সাবুদ চাই, সকল লোকের সমর্থন চাই। এইসব ভেবেচিন্তেই দারোগা তাকে ছেড়ে দিলে। তবে বলে দিলে,—দেখ, এসব কথা আর বোলো না। সাজা হয়ে যাবে। এবার আমি ছেড়ে দিলাম। এরপর আর ছাড়ব না।

কালা গোঁসাই বললে,—ঠিক হ্যায় রে বাবা। যাও তুম নিদ যাও।

বলেই সে রাস্তায় নেমে এসে বললে,—বোম্ মহাদেও টন্ গনেশ। ভেজো সাত্তু নুন সমেত। চেৎ-

এবং নবগ্রামেই সে একটা গাছতলায় তার চিমটেটা পুঁতে তার সামনে বসে গেল। দিন-দুয়েক ধ্যানস্থ হয়ে বসে থেকে হঠাৎ তিন দিনের দিন চিৎকার করে উঠল,—যজ্ঞ, যজ্ঞ হবে! শান্তি-যজ্ঞ! হাঁ। দেশের অশান্তি বিলকুল দূর হয়ে যাবে। শান্তি-যজ্ঞ। হিংসা দূর হবে। অন্নকষ্ট দূরে যাবে। হিন্দুস্থান পাকিস্তানমে শান্তি আয়েগা। উঠাও চন্দা।

আর কিন্তু চাঁদা উঠল না। তখন কালা গোঁসাই শিব স্থাপন করলে এবং ধুনি জ্বাললে। চেলা জনকয়েক আগেই জুটেছিল—ঘোঁতনা হাজরা, লাটু চৌধুরী, গণ্ডার ঘোষ—এদের সঙ্গে নবগ্রাম থেকে জুটে গেল—বাসের ক্লীনার ইস্কাপন, গাঁজাল গাইয়ে ভোলা, উদাসী গোবিন্দে, রাইস-মিলের ফিটার বিলাইতিরাম এবং আরো জনকতক। তার মধ্যে ছিঁচকে চোরা হাবলা ছিল এবং দুজন গুলি-খোরও ছিল, তাদের মধ্যে একজন মুসলমান। আর জুটেছিল পরম বায়েন। পরম বায়েন গ্রামের দেবস্থানে ঢাক বাজাত, পাকী মদের ভক্ত ছিল সে। পরম সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা কালী গোঁসাইয়ের শিবতলায় ঢাক বাজাতে শুরু করলে। দিনকয়েক পরেই বেগুনি ফুলুরির দোকানদারনী রামদুলারি এসে গড় করে বললে,—মহাদেওজীর স্বপন মিলেছে তার—কি, সাধু মহারাজের বড় কষ্ট হচ্ছে—একটা চালা বানিয়ে দিতে হবে—আর ধুলোমাটিতে বসে থাকতে মহাদেব পর্‌ভুর বড় গা-ঘিনঘিন করছে—একটা বেদী বানিয়ে দিতে হবে। এখন সাধু মহারাজের হুকুম চাই।

কালী গোঁসাই বললে,—ভাগ—ভাগ যা! নেহি মাংতা। তু তো পাপিনী হ্যায়।

ছোটখাট মাথায়, মুখে বসন্তের দাগ—রামদুলারিকে লোকে পাপিনীই বলত। রামদুলারির নাকি বাচ্চা চোরের দল আছে—

দশ-বারোটা ভিখারী—তারা ঘাট থেকে বাসন তুলে আনে, দুপুরবেলা বাড়ি ঢুকে শুকুতে-দেওয়া কাপড় নিয়ে আসে, ফাঁক পেলে ঘরে ঢুকে ফুলদানিটা কলমটা এটা-ওটা নিয়ে আসে। রামদুলারি সত্যিই দুষ্ট লোক।

রামদুলারি গোঁসাইয়ের পা জড়িয়ে ধরলে,—হুকুম দাও সাধুজী মহারাজ! রামদুলারিকে প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও!

ভক্তদের অনুরোধে গোঁসাই সম্মতি দিলে। এবং বেশ চমৎকার একটি স্থান তৈরি হয়ে গেল। আটটা পাকা থাম গেঁথে তার উপর খড়ের চাল দিলে। একদিকে চার হাত লম্বা দু-হাত চওড়া এক হাত উঁচু সিমেণ্ট দিয়ে মাজা বেদীর উপর ত্রিশূল পুঁতে, তারই গায়ে লম্বাটে শিব-ঠাকুরকে বসানো হল। খুব ঘটা করে ঢাক বাজালো পরম বায়েন। পুজো হল। একটা পাঁঠা এনে বলি দিলে ঘোঁতনা হাজরা। লোকজন জমল অনেক। তার মধ্যে থেকে হঠাৎ টেঁপি ঠাকরুন তারস্বরে বললে,—সর রে, সব রে! ওরে অ-মুখপোড়ারা, সর না রে! দেখি! বাবা উঠলেন? দেখি!

নবগ্রামের টেঁপি বা ট্যাপা ঠাকরুন দেবভক্তি এবং পুণ্যের জন্য বিখ্যাত। নবগ্রামের কোন দেবতা বলতে পারে না যে ট্যাপা ঠাকরুনের আগে কেউ তাকে কোনদিন প্রণাম করেছে, বা তার থেকে জোরে মাথা ঠুকে প্রণাম করেছে। ট্যাপা ঠাকরুন প্রণাম করলে ঠক্ ঠক্ শব্দ ওঠে—এবং কপালের ঠিক মাঝখানে একটা টাকার আকারের গোল কালচে রঙের আব আছে। সেটা ঐ প্রণাম করে-করেই সৃষ্টি হয়েছে।

সরে গেল লোকজন; ট্যাপা ঠাকরুন খুঁট থেকে একটি পয়সা ফেলে দিয়ে প্রণাম করে বললে,—তা বেশ হল। একটি নতুন বাবা হলেন! তা—বাবার নামটি কী গোঁসাই? অ্যাঁ? বাবাকে পুজোর ফলটাই বা কী?

কালী গোঁসাই বললে,—আমি কালী গোঁসাই, শিব তাহলে কালিকেশ্বর।

—চমৎকার নাম। কালিকেশ্বর! বেশ নাম। তা, ফলটা কী হল?

—ফল আবার কী? ফল পুণ্য—ফল ধর্ম।

—উঁহু! শুধু পুণ্যি ধম্মো—সে তো ঘরে বসেই হয় গো। তার নেগে এতটা পথ হাঁটলাম কেন? ঐ দেখ মনসাতলায় গরল ভাল হয়। ঐ তোমার কলেরা হলে রক্ষেকালী রক্ষে করেন। তারপরেতে তোমার ষণ্ডেশ্বর বাবার পুষ্পে গো-মড়ক ভাল হয়। কি বলে—এলোকেশী মায়ের মহিমায় টাক পড়া বন্ধ হয়। তা, তোমার শিবের একটা মহিমা তো চাই বাবা!

—হাঁ। উ মহিমা বাবা মহাদেও নিজসে দেখাইয়ে দিলেন গো! শুধাও তো রামদুলারিকে। চুরির পাপ খণ্ডন করে মা। কোই চুরি কিয়া—বস্, সওদা পাঁচ আনা আঁধিয়ারামে রাখ্ দিয়ো বাবাকে আস্তানা মে—ব্যস, বিলকুল পাপ খণ্ডন হোগা।

—তা বেশ, তা বেশ। না, ওর সঙ্গে আর-একটা মহিমে কর বাবার। এই দেখ—এই গরমের সময় সারা গায়ে ঘামাচির জ্বালায় মরি। চুরির পাপ-ক্ষয়ের দক্ষিনে সওয়া পাঁচ আনা—তা, ঘামাচিতে তখন পাঁচ পয়সাই ঢের। তা, পাঁচ পয়সা আমি দোব—বাবা যদি আমার ঘামাচি দিবারণ করে। ঘামাচি ধর সবারই হয়। তুমি তোমার শিবকে বল—ঐ মহিমাটি ধরুন উনি।

কালী গোঁসাই সঙ্গে-সঙ্গে একমুঠো ধুনির ছাই তুলে ট্যাপা ঠাকরুনের হাতে দিয়ে বলেছিল,—একটু হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে গায়ে মেখো। ব্যস, দেখো বাবার মহিমা!

ঐ ঘামাচির মহিমাতেই কালী গোঁসাইয়ের শিবস্থান জমে উঠেছিল। দিনের বেলায় ঘামাচি-পীড়িত মেয়ে-পুরুষের ভিড় জমে যেত। রাত্রেও জমত। সে ঐ রামদুলারি যে পাপমোক্ষণ ফল প্রাপ্ত হয়েছে, সেই ফলের প্রত্যাশীরা এসে জমত। সে আনাগোনা জমজমাট রাত্রিকালে অর্থাৎ অন্ধকারে লোকচক্ষুর অগোচরে।

মাঝরাত্রে বা শেষরাত্রে তারা এসে ঐ সওয়া পাঁচ আনা হিসাবে পয়সা রেখে যেত। এবং এই পয়সার পরিমাণ যত বেশি হতে লাগল, ততই সে-অঞ্চলটায় চুরি বাড়ল—সে কথা বলা বাহুল্য। ওদিকে কালী গোঁসাইয়েরও চেহারা বের হতে লাগল। লোককে গালি-গালাজ, অপমান—ক্রমে চড়চাপড়, ঘুসি, গলা টিপে ধরে শাসানো—নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। এবং থানার দারোগা আবার চঞ্চল হল। একদিন এসে হাজির কালা গোঁসাইয়ের ওখানে। সঙ্গে আর-একটি ভদ্রলোক। লোকটিকে দেখেই গোঁসাই প্রায় ক্ষেপে লাফ দিয়ে উঠল। কিন্তু তার আগেই ভদ্রলোক এবং দারোগা দুজনেই দুটো পিস্তল বের করে ধরলেন—খবরদার!

কালা গোঁসাই কুৎসিত ভাষায় গাল পাড়তে লাগল। সে শোনা যায় না, কানে আঙুল দিতে হয়। কিন্তু গোঁসাইয়েব সে বাছ-বিচার নেই! গ্রাহ্যও নেই! এমনকি পুলিশের গুঁতোও দু-দশটা পড়ল, তবুও গ্রাহ্য করলে না।

—আরে আমি হলাম নেপাল গুণ্ডা। ঐ গুঁতোয় আমার কী হবে?

—সালা—দেখ্ রে হামারা শির—কেত্না ডাণ্ডা খায়া দেখ্! দেখ্ রে বে পিঠ, ছোরাকে দাগ। খুলনেতে একবার সড়কি চালাই-ছিল—জানুতে বইসা ফিনিক মাইরা খুন ছুটল—অ্যাহি এত্যানি ঠাঁই ই-ফোঁড় উ-ফোঁড়! দাগ রইছে। ক-ঘা রুলের গুঁতায় কী অইব রে হালা!

লোকের সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু এতখানি না। ঐ আগন্তুক ভদ্রলোকটি সি-আই-ডি-র ইন্স্পেকটর। খবর নিয়ে এখানে এসেছেন। এসে দেখেন—কালা গোঁসাই কলকাতার বিখ্যাত নেপাল গুণ্ডা—ওকে গুণ্ডা-আইনে প্রথম কলকাতা থেকে পরে বাংলা দেশ থেকেই বের করে দেওয়া হয়। বেহারে গিয়ে নেপাল হয় কালা গুণ্ডা। সেখান থেকে যায় পূর্ববঙ্গে—সেখানে নাম নিয়েছিল—কালু

সর্দার। রাহাজানি, নৌকায় ডাকাতি, চুরি—অনেক করেছে সেখানে। দেশ ভাগ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে এখানে চলে এসেছে। এ অঞ্চলে এসে হয়েছে কালী গোঁসাই বা কালা গোঁসাই।

দারোগার সঙ্গের ভদ্রলোকটি কলকাতার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেণ্টের লোক। এখানকার দারোগা কালা গোঁসাইয়ের বিবরণ কলকাতায় পাঠিয়েছিল। লিখেছিল—এই সাধুপুরুষের আবির্ভাবে এখানে চুরি-ডাকাতি বেড়েছে, সুতরাং সাধুর অতীত সাধনার বিবরণ যদি কিছু তাঁদের জানা থাকে তবে সেটা জানালে তাঁর সুবিধে হয়। তাঁর আকার-প্রকার জানাবার জন্য গোঁসাইয়ের একখানা ফোটোগ্রাফও তিনি পাঠিয়েছিলেন। সেই পেয়েই ঐ ভদ্রলোক হাজির হয়েছিলেন।

যাই হোক, কালা গোঁসাই গ্রেপ্তার হয়ে চালান হল। কিন্তু মাসকয়েক পরেই আবার—কালী কলকাতাওয়ালী, হাতমে ভোজালী, লড়ে হালি হালি—বম্ শঙ্কর—বম্ শঙ্কর, বলে ফিরে এসে ফের বসে গেল আপনার ঠাকুরতলায়।

বললে,—কেয়া করেগা পুলিশ? আমি হলাম মা-কালীর ছেলে, বাবা শিবের বেটা! আমার কী করবে? মা-বাবাতে স্বপ্ন দিলে—ছেড়ে দে! বাপ্ বাপ্ বলে ছেড়ে দিলে। আরে, মুই কি আপনা লেগ্যা কিছু করছি, যা করছি ধর্মের লেগ্যা—দশের লেগ্যা করছি। কালা গোঁসাইকে পাপ ছুঁতে পারে না, হ্যাঁ! বোম্ শঙ্কর বো—ম্! এবং এরপর থেকে গোঁসাই শুধু গোঁসাই থাকল না—গোঁসাই বাবা হয়ে উঠল। বিক্রম পরাক্রম শতগুণ বেড়ে গেল।

রাস্তায় ভিড় জমে আছে—গোঁসাইয়ের হাঁক উঠল—বোম্ শঙ্কর! হরণ কর পাপ, শীতল কর তাপ! ঘামাচি বিলকুল ভালা কর বাবা!

সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তার ভিড় দু-দিকে সরে গেল। রাস্তা হয়ে গেল গোঁসাইয়ের জন্য। কেউ নড়তে দেরি করলে গোঁসাই তার মাথায় মারলে গাঁট্টা। বললে,—কেয়া রে অধর্মী!

গোঁসাই হাটে গেল, সেখানে গিয়েই মারলে হাঁক,—কালী কলকত্তাওয়ালী হাঁত মে ভোজালী লড়ে হালি হালি। ঘামাচি-মারণ পাপ-হরণ বাবা কালিকেশ্বর শিবের জন্যে বেটি রান্না চড়িয়ে বসে আছে বাবা-সব! দেও তোলা। আন সব্জি।

কারো ডালা থেকে বেগুন, কারো ডালা থেকে মুলো, কারো কাছ থেকে কুমড়ো, কারো কাছ থেকে লাউ, আলু, কপি নিলে টেনে তুলে এবং সঙ্গের চেলার ঝুড়িটায় চাপিয়ে আর বার-দুই হাঁক দিয়ে চলে এল।

একদিন একজন গোঁসাইয়ের হাতে ধরা লাউটা কাড়তে গিয়ে বলেছিল,—না, ওটা আমি দোব না! ওরে বাবারে—আমি মরে যাব! না—না!

বাস, সঙ্গে-সঙ্গে গোঁসাইয়ের হাতের চিমটে উঠে গেল। অবশ্য লোকটার মাথায় মেরে মাথা ফাটিয়ে জেল যাবার মত বেকুব গোঁসাই নয়—সে চিমটে চালালে তার লাওয়ের গাদার উপর। দুমদাম্ দুমদাম্। লাউগুলি একেবারে কেটে কেটে ছেতরে গেল।

এতেও বারকয়েক থরা পড়তে হয়েছে কালা গোঁসাইকে কিন্তু কোনটাতেই দণ্ড হয় নি। কালা গোঁসাইয়ের ডাণ্ডার ভয়ে কেউ সাক্ষ্য দিতে রাজি হয় নি। যারা পুলিশের ভয়ে আদালতে গিয়েছে, তারা সেখানে গিয়ে সব গোলমাল করে দিয়েছে।

এই হল কালা গোঁসাই।

না। হল না। কালা গোঁসাইয়ের শক্তি এবং সাহসের কথা না বললে হবে না। কালা গোঁসাই লাঠি মেরে একটা ক্ষ্যাপা মহিষের শিঙ ভেঙে দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করেছে। একটা কুকুর পাগল হয়ে দশ-বারোটা লোককে কামড়েছিল, সেটা কালা গোঁসাইকে পথে পেয়ে তাড়া করেছিল। গোঁসাইয়ের হাতে এক লোটা ছাড়া কিছু ছিল না। গোঁসাই সেই লোটার এক ঘায়েই পাগলা-কুকুরটার মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলেছিল।

এই হল কালা গোঁসাই।

এই কালা গোঁসাইকে কি জটে-পাগলা মেরে ফেলেছে? এও কি হতে পারে?

জটে-পাগলা প্রায় জন্মপাগল। ইদানীং একেবারেই পাগল হয়ে গিয়েছিল। শিবু কর্মকারের ছেলে। শিবুর অবস্থা খুব ভাল নয়—তবে, মোটা ভাত মোটা কাপড় আছে। কিন্তু জটে বাড়িতেই থাকত না। ঘুরে বেড়াত এখানে-সেখানে করে। বিশ-বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত সে বাড়িতে থেকেছে, সে-বয়স পর্যন্ত বাপের সঙ্গে কামারশালায় খেটেছে। বড় সাঁড়াশি দিয়ে বাপ ধরত জ্বলন্ত লোহা—সে পিটত তার উপর হাতুড়ি। বড় হাতুড়ি। শেষ পর্যন্ত গোরুর গাড়ির চাকার হাল বসাতে সে ধরত সাঁড়াশি আর চাষীরা মারত হাম্বর। কাজটা সহজ বলে ঐটেই ওর বাপ ওকে ছেড়ে দিয়েছিল। সকলে বলত,—পাগল কিন্তু জোয়ান হবে ভাল। তাই হয়েওছিল। বিশ-বাইশ বছর বয়সে জটে একেবারে লোহার মানুষ হয়ে উঠল। তারপরেই জটের মাথার গোলমাল বাড়ল। গোলমাল বাড়ল বাবুদের থিয়েটার দেখে। সীতাহরণ পালা দেখে কেঁদে একেবারে সারা! সীতা সেজেছিল কলকাতার একটি ছেলে। যেমন তাকে মানিয়েছিল তেমনি সে পার্ট করেছিল। রাম সেজেছিল এই গ্রামেরই শিবনাথ, সেও পার্ট করেছিল ভাল। রাত্রে অভিনয় দেখে জটে আর বাড়ি ফেরেনি, বাকি রাতটা ঐ ফাঁকা আসরেই বসে কেঁদেছিল। সকালবেলাতেই বোঝা গেল ওর মাথার গোলমাল বেড়েছে। সাহাদের উমেশকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে তার হাতখানা খপ্ করে চেপে ধরে বললে,—পাষণ্ড! মিথ্যুক! কাপুরুষ!

উমেশ অবাক এবং আশেপাশের লোকেরা অবাক! হল কী? উমেশ বললে,—ছাড়, ছাড়, লাগে, লাগে!

—লাগে? বদমাস! নির্লজ্জ! মরার ভান করে পড়ে থেকে তোর বাঁচতে লজ্জা হল না?

—কী বলছিস ? যা গেল !

—কী বলছি ? পাষণ্ড, তুই রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ তাহলে প্রাণ দিয়ে করিস নাই ? মিছে করে মরে গিয়েছি বলে পড়ে রইলি ! আর সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেল রাবণ !

উমেশ জটায়ু সেজেছিল। জটায়ুর আত্মদান জটেকে মুগ্ধ করেছিল। উমেশকেই সে প্রণাম করেছিল বারবার। চিৎকার করে বলেছিল,—বলিহারি উমেশ, বলিহারি ! বাঃ ভাই, বাঃ ! মহা পুণ্য তোমার—মহা পুণ্য !

তাই আজ উমেশকে জীবিত দেখে সে ক্ষেপে গিয়েছে। তাহলে ও সত্যকারের যুদ্ধ করে নাই ! প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিছিমিছি মরে যাবার ভান করে পড়ে গিয়েছিল—রাবণ মরা ভেবেই তাকে ছেড়ে দিয়েছে ! ওরে পাষণ্ড ! ওরে কাপুরুষ ! তোর প্রাণের মায়াটাই এত বড় হল রে ?

লোকে হেসে সারা হল। অনেক বুঝিয়ে বললে,—যাত্রা-থিয়েটারে যা হয়, তা কি সত্যি রে ? সব মিছে।

এর পর থেকে সে শিবনাথের বাড়ি আনাগোনা শুরু করলে। শিবনাথকে তার বড় ভাল লেগেছে। রাম। সে রাম।

শিবনাথ শুধু রাম নয়, সে এখানকার গ্রামের মুকুটহীন রাজা। সাধারণ ঘরের ছেলে। লেখাপড়া শিখেছে—এম, এ, পাশ। এখানকার সকল কল্যাণজনক অনুষ্ঠানের সে নেতা। বিয়ে করেনি, এইসব নিয়েই আছে। যেমন মিষ্টি কথা, তেমনি সুন্দর তার চেহারা।

শিবনাথের বাড়ি গিয়ে সে ধরলে—সেও থিয়েটারে পার্ট করবে।

শিবনাথ কাউকে দুঃখ দিয়ে ফিরিয়ে দেয় না। 'না' বলতে তার মুখে বাধে। সে বললে,—দেব, পার্ট দেব তোকে।

জটে উৎসাহিত হল এবং সঙ্গে-সঙ্গে সে তার গুণপনার পরিচয় দিলে অভিনয়ের ভঙ্গিতে বক্তৃতার সুরে,—কে রে ? কে রে ? কামাতুর পাপাচারী পিচাশ—

শিবনাথ সংশোধন করে দিল,—পিচাশ নয়, পিশাচ।

—পিশাচ? আচ্ছা।—কে রে কামাতুর পাপাচারী পিশাচ—নিষ্কলঙ্ক স্বর্ণপ্রতিমা, শুচিতার প্রতিমূর্তি, নবনীততনু দেবীকে হরণ করে নিয়ে যাচ্ছিস?—কে?

তারপর হঠাৎ চমকে উঠে বললে,—চিনেছি! ওরে তুরাত্মা, ওরে ব্যাভিচারী—চিনেছি, চিনেছি তোরে! পাপাচারী লঙ্কাপতি রাক্ষস রাবণ! রামের ঘরনী তুই করিলি হরণ? কিন্তু রক্ষা নাই তোর। গড়ুরের পুত্র আমি—জটায়ু আমার নাম। বৃদ্ধ আমি, তবু আজও নখর প্রখর মোর। নখর-আঘাতে তোর দশ মুণ্ড করিব ছেদন!

পার্ট তার প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়—এমন ক্রুদ্ধ ভঙ্গি করে রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললে যে, সে যেন সত্যিই জটায়ু।

তারপর ভাঙা গলায় কাতরভাবে মুমূর্ষুর মত শিবনাথের সামনে হাত জোড় করে বললে,—সম্মুখে দাঁড়াও তুমি রাম, হে বিশ্বের জীবনাভিরাম দূর্বাদল শ্যাম, ওহে মনোরম!

থর-থর করে কাঁপতে লাগল তার কণ্ঠস্বর।

শিবনাথের ভারি ভাল লাগল। সত্যিই পাগল অভিনয় করতে পারে।

কাল অভিনয়ে উমেশ যা করেছে, যেমন ভাবে বলেছে, তার থেকে সত্যিই ভাল, প্রাণবন্ত। সে প্রশংসাই করলে। বললে,—তাইতো রে! সত্যিই তো তুই খুব ভাল বক্তৃতা করতে পারিস! এ তো চমৎকার!

জটে বললে,—তাহলে আমায় ঐ পার্টটা দাও! বেটা উম্‌শা—কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক! ও মরে নাই, দিব্যি বেঁচে আছে! সকালবেলা দেখলাম একটা কাঠি চিবিয়ে দাঁতন করছে! আজ আমি জটায়ু হব!

শিবনাথ বললে,—ওরে সর্বনাশ! তুই সত্যি-সত্যি মরবি নাকি?

—তা নাহলে কী করে জটায়ু হব!

—তাহলে পুলিশে রাবণকে ধরে নিয়ে যাবে।

—তুমি রাম, তুমি ভগবান, তুমি রাজা—তুমি বারণ করে দিয়ো। বোলো—জটায়ু স্বর্গে গিয়েছে। যুদ্ধ করে মরেছে। ও পার্ট আজ আমি করবই।

—কিন্তু আজ তো আর 'সীতাহরণ' পালা হবে না জটাধর।

—হবে না? হতাশ হয়ে গেল জটাধর।

—না। আজ রাণা প্রতাপ হবে।

—সে আবার কী পালা?

—খুব যুদ্ধ আছে। আমি শক্তসিংহ সাজব।

এতে জটাধর বিন্দুমাত্র উৎসাহ বোধ করলে না। আস্তে আস্তে উঠে গেল। রাত্রে থিয়েটার দেখতে এল—কিন্তু প্রথম দৃশ্যেই রাণা প্রতাপ ও শক্তসিংহের ঝগড়া দেখে সে বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে,—একটা বুনো শুয়োর মেরেছে—তাই নিয়ে ভাইয়ে-ভাইয়ে ঝগড়া! ব্রহ্মহত্যা হয়ে গেল! রাম! রাম! এই আবার দেখে!

বলে সেই অভিনয়ের মধ্যেই উঠে দাঁড়িয়ে ছোট ভাই গঙ্গাধরকে ডেকে বললে,—চলরে গোঙা—বাড়ি চল। রাত হয়েছে—ভাত খেয়ে শুবি চল। ই আর দেখতে হবে না!

চলে গেল সে।

* * *

শিবনাথের বাড়ির পথই আর সে মাড়ালে না। মাসকয়েক পরে শিবনাথই তাকে ডাকলে। আবার অভিনয় হবে। জটাধরের অভিনয়ের শক্তি আছে, তাকে সে পার্ট দেবে। জটাধরের মাথাটা তখন অপেক্ষাকৃত সুস্থ রয়েছে। এবং পার্ট সে ভালই করলে সেবার। সকলেই তারিফ করলে জটাধরের। বললে,—ওরে! এ যে ধুকুড়ির ভিতর খাসা চাল! ক্ষ্যাপা যে বেড়ে অভিনয় করে! অ্যাঁ!

জটাধর ঘাড় নেড়ে বললে,—জটায়ুর পার্ট যদি দিত দেখতে! দেখিয়ে দিতাম এক হাত!

এরপর জটাধর থিয়েটার থিয়েটার করেই পাগল হয়ে উঠল।

শিবনাথের বাড়ি নিত্য হাজিরা দেয় এবং প্রশ্ন করে,—আবার কবে থিয়েটার হবে, তা বল।

মধ্যে-মধ্যে বলে,—এই দেখ, রাম সাজলে তোমাকে যেমন মানায় তেমন কিছুতে মানায় না। আর-একবার 'সীতাহরণ' পালাটা কর। আমি একবার জটায়ু সাজি! একবার দেখিয়ে দি!

বলেই আরম্ভ করে,—কে রে? কামাতুর পাপাচারী পিশাচ? আরে আরে চিনিয়াছি তোরে। পাপাচারী লঙ্কাপতি রাক্ষস রাবণ!

শিবনাথ হাসে।

জটাধরও হাসে এবং হাসতে-হাসতেই শিবনাথের পা-খানি টেনে নিয়ে টিপতে শুরু করে বলে,—রামচন্দ্র, এবার তুমি বিয়ে কর। সীতা আন ঘরে।

শিবনাথ বলে,—জটা, ওটা আর কপালে নেই। বুঝলি, হরধনু ভাঙবার ক্ষমতা নেই। অভাবের লোহাতে গড়া ধনুক—ও ভাঙতে আমার সাধ্য নেই।

হঠাৎ কিন্তু অঘটন ঘটে গেল। অভাবের লোহায় গড়া ধনুকখানা সত্যিই ভেঙে ফেললে শিবনাথ। নিজেও জানতে পারলে না—কেমন করে কী হল। হঠাৎ রাতারাতি বিখ্যাত লোক হয়ে গেল। শুধু তাই নয়—অভাব ঘুচে টাকার বাজারে দাম বেড়ে গেল তার। সে হল ঐ থিয়েটার থেকে।

শিবনাথের এক বন্ধু সিনেমায় কাজ করত; সে একখানা ছবিতে ডিরেক্টার হয়ে গেল। সে-ই ওকে টেনে নামালে ছোটখাট একটা ভূমিকায়। শিবনাথের তাতেই নাম হয়ে গেল। চেহারাটা ছিল ভাল, তার উপর অভিনয় হল সবার সেরা; তারপরেই দুটো ছবিতে আরো পার্ট করে তিনটের বেলায় হয়ে গেল হিরো।

এক বছর পরে শিবনাথ যখন দেশে ফিরল তখন সে বিখ্যাত ব্যক্তি তো বটেই, উপরন্তু অভাব তার ঘুচে গেছে। এক বছরে চারখানা

ছবিতে সবসুদ্ধ পাঁচ-ছ হাজার টাকা রোজগার করেছে এবং দশ-বারো হাজার টাকার কণ্ট্র্যাক্ট পেয়েছে। চেহারা পর্যন্ত পালটে গেছে তার।

গ্রামের লোক প্রায় ভিড় করে তাকে দেখতে এল। জটাধরও এল। সকলেই শিবনাথকে অভিনন্দিত করে ফিরে এল—বসে রইল জটাধর।

জটাধরের চেহারা দেখে শিবনাথ চমকে উঠল। এ কী চেহারা হয়েছে জটাধরের!

জটাধরের ঠোঁটদুটো কাঁপতে লাগল। চোখে জল এল। সে বললে,—তুমি এত নিষ্ঠুর! আমাকে ফেলে তুমি গেলে! এরা আমাকে পার্ট দেয় না। বলে, পাগল।

জটাধরের মাথা আবার খারাপ হয়েছে। শরীর শীর্ণ হয়েছে, মাথার চুল উস্কোখুস্কো। ময়লা কাপড়-জামা। জামা নয়, একটা গেঞ্জি। ঘরের কাজকর্ম করে না, শুধু ঘুরেই বেড়ায়। বলে,—দেখবে, দেখবে। যাব কলকাতা। রামচন্দ্র এলে হয়! সিনেমায় নামব। বড্ড নাম হবে!

শিবনাথকে বললে,—আমি পার্ট করতে পারি না? উমশা আমার চেয়ে ভাল পার্ট করে? তুমি বল! কই, সে বলুক আমার মত?

বলেই আরম্ভ করলে,—কে রে? কে রে কামাতুর পাপাচারী পিশাচ? আরে আরে, চিনিয়াছি—চিনিয়াছি তোরে। পাপাচারী লঙ্কাপতি রাক্ষস রাবণ!

শিবনাথ তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্যই বললে,—পার্ট তুই সত্যিই ভাল করিস জটাধর।

—তবে আমাকে নিয়ে চল তোমার সঙ্গে!

—কলকাতায়?

—হ্যাঁ।

এ কথার কী জবাব দেবে শিবনাথ! মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে সঙ্কোচ হল তার। সে চুপ করে রইল। জটাধর ডাকলে,—রামচন্দ্র!

—না রে, ওসব জায়গা ভাল নয় জটাধর। ওসব জায়গা বাবুদের। বাবুরা সেখানে চাষী সাজে, মুটে সাজে। চাষী মুটে যারা সত্যিকারের তাদের তারা নেয় না।

—তুমি একবার আমাকে একটা পার্ট দিয়ে দাও। তার পরে আমি দেখে নেব।

—আচ্ছা দেখব।

দিনকয়েক থেকেই শিবনাথ চলে গেল। জটাধর বললে,—তোমার চিঠি পেলেই আমি চলে যাব। চিঠি দিয়ো।

শিবনাথ বললে,—দেব। অবশ্য নিতান্তই সান্ত্বনা-বাক্য।

জটাধর তারপর নিত্য যেত পোস্টাপিসে,—আমার চিঠি আছে পিওন? জটাধর কর্মকার?

—নাই।

পরের দিন আবার।

—নাই।

আবার পরের দিন।

—নাই।

—মিছে কথা! ভাল করে দেখ। মাস্টারবাবু, তোমার পিওন নিশ্চয় আমার চিঠি মেরেছে!

মাস্টার ধমক দিয়ে বললে,—ভাগ্‌ পাগলা! পাগলামির আর জায়গা পাসনি?

কে যেন একজন রসিকতা করে বললে,—হায় প্রভু রামচন্দ্র—দুর্বাদলশ্যাম! তুমিও বঞ্চনা করলে দীন ভক্ত জটায়ু অধমে! হায় রাম!

মুহূর্তে কী হয়ে গেল জটাধরের। একটা চিৎকার করে উঠল আহত পশুর মত। এবং ছুটে পালিয়ে গেল গ্রাম থেকে।

বেরিয়েছিল সে কলকাতা যাবে বলে। কিন্তু মাস দু-তিন পর বাড়ি ফিরল—বদ্ধ পাগল হয়ে। গ্রামের প্রান্তে, রাস্তার ধারে বসে

থাকত। চিৎকার করে থিয়েটারের পার্ট বলত। মধ্যে-মধ্যে যেত থিয়েটারের বর্তমান পাণ্ডা দেবকুমারবাবুর কাছে।

—'সীতাহরণ'টা একবার কর। শিবনাথ রাম—আমি জটায়ু। পাঁচ টাকা চাঁদা দোব আমি। ভিক্ষার টাকা থেকে সত্যিই সে পাঁচ টাকা জমিয়ে রেখেছে।

—আর কলকাতার লোকদের নেমন্তন্ন কর। তারা দেখে যাক —শিবনাথ রাম করে ভাল, না—আমি জটায়ু করি ভাল। আমাকে নিশ্চয় নিয়ে যাবে তারা। আমি যা রোজগার করব তার অর্ধেক থিয়েটার-পার্টিকে দোব। কর একবার ঐ পালাটা।

দেবকুমার বলে,—বিরক্ত করিসনে বাপু—যা, এখান থেকে যা।

শেষ পর্যন্ত বলে,—বেরো বলছি!

এই জটে পাগলা। শেষ পর্যন্ত নখে চুলে, দাড়িতে-গোঁফে বীভৎস হয়েছিল চেহারা। দেহ হয়েছিল শীর্ণ। জটে খেত না ভাল করে। এই জটে পাগলা কালা গোঁসাইকে হত্যা করতে পারে—এ কি সম্ভব?

* * *

শিবনাথ জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে বললে,—তা-ই হয়েছে শ্রীযুত বোস। আমি বলছি আপনাকে।

যেদিন সকালে কালা গোঁসাই এবং জটে-পাগলার লাস চালান গেল, সেইদিন বিকেলবেলা শিবনাথ এল গ্রামে। খবর পেয়ে সে ছুটে গেল সদরে। একা নয়, সস্ত্রীক। শিবনাথ মাস-কয়েক আগে বিয়ে করেছে। মাসখানেক আগে বউ নিয়ে এসেছিল গ্রামে। বউটি সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে, গান গায় ভাল। বউ নিয়ে গ্রামে এসে সে বেশ সমারোহ করে খাইয়েছে লোকদের।

জটাধর এসেছিল।

চুপি-চুপি শিবনাথকে বলেছিল,—খাসা সীতা হয়েছে রামচন্দ্র! এইবার সেই পালাটা একবার কর। আমি দশ টাকা জুগিয়ে রেখেছি, বুঝেছ?

শিবনাথ বলেছিল,—হবে। তুই পেট ভরে খা।

পেট ভরে খেয়ে সে শিবনাথের বউকেও তার পার্ট শুনিয়েছিল।

বলেছিল,—তুমি বল রামচন্দ্রকে। বুঝেছ মা!

শিবনাথের বউ বলেছিল,—বলব। কিন্তু হেসেছিল।

জটাধর রাগ করে চলে গিয়েছিল।

শিবনাথ ম্যাজিস্ট্রেটকে বললে,—আমাকে হঠাৎ যেতে হয়েছিল কলকাতা। জরুরি কাজ। এক ঘণ্টার মধ্যে রওনা হতে হল। সেই কারণে আমার স্ত্রী রইলেন। কথা রইল—কাজ সেরে ফিরে এসে ওঁকে নিয়ে যাব। ওঁর তো ধনুকভাঙা পণ এখানে একখানি ছোট বাড়ি পত্তন না করে যাবেন না। গ্রামের প্রান্তে যেখানে জটে এবং কালা গোঁসাই মরেছে তার খানিকটা এদিকে আমার বাড়ির জায়গা ঠিক করেছিলাম। যেদিন আমি গেলাম, সেদিন স্টেশনের পথে জটাধরের সঙ্গে দেখা হল। বললাম,—হ্যাঁরে রাগ করেছিস?

রাগই সে করেছিল। আমার কথার জবাব দিলে না।

বললাম,—রাগ করিস নে। আমার বউয়ের ঐ স্বভাবটা মন্দ। কথা বলতে গিয়ে হেসে ফেলে। ঐজন্যে ওকে কেউ পার্ট দেয় না।

সে বললে,—রিহার্স্যাল দাও, সেরে যাবে। আমি ধমক দিয়ে সারিয়ে দোব। তুমি পালা ধর।

শিবনাথ বললে,—তাড়াতাড়ি ছিল আমার, আমি বললাম,—আমি ফিরে আসি, এসে তাই করব।

জটাধর বললে,—কোথা যাবে তুমি?

—কলকাতা।

—সীতা?

—রইল।

শিবনাথ ম্যাজিস্ট্রেটকে বললে,—তারপর শুনুন আমার স্ত্রীর কাছে। বল কল্যাণী।

শিবনাথের স্ত্রী কথা বলতে গিয়ে যেন বলতে পারছে না। তার ঠোঁটদুটো কাঁপছে।

শিবনাথ বললে,—সঙ্কোচ কোরো না। সঙ্কোচের এতে কিছু তো নেই!

শিবনাধের স্ত্রী কল্যাণী আঁচলের খুঁট আঙুলে জড়াতে-জড়াতে বললে,—এখানে এসে এ গ্রাম আমার বড় ভাল লেগেছে। লাল মাটি, খোলা মাঠ আর এখানকার রাত্রের আকাশ দেখে আমার কেমন যেন মনে হয়, আমি যেন হারিয়ে যাই। তাই আমি জেদ ধরেছিলাম, এইখানে বাড়ি কর। গ্রামের ভিতর পুরানো বাড়িতে নয়—গ্রামের শেষে খোলা মাঠের ধারে। যে বাগানটায় এই কাণ্ড ঘটেছে সেই বাগানটার ধারে ওঁর খানিকটা জমি আছে—সেখানটাই আমার পছন্দ হল। ওঁকে টেনে আমিই নিয়ে গেলাম ইটের ঠিকাদারের কাছে—রাজমিস্ত্রিদের ডাকলাম। তাছাড়া ওঁকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামের বহু জায়গা দেখে বেড়ালাম। ওঁর ছেলেবেলার প্রিয় জায়গাগুলি দেখালেন উনি। যে জায়গায় কালা গোঁসাই তার আস্তানা পেতেছে—সেই জায়গা ছিল ওঁদের ছেলেবেলার ভয়ের জায়গা। বলতেন, ফুটবল খেলে ফিরবার সময়ে ঐ জায়গাটা ওঁরা প্রায় চোখ বুজে পার হতেন। ওখানে নাকি ভূত ছিল। ওখানেই দেখলাম—কালা গোঁসাই এসে ওঁকে বললে—আরে বেটা, তুই নাকি ভারি আমির আদমি! সিনেমামে পার্ট কর? তুমার বহু? ও করে?

উনি বললেন,—না।

কালা গোঁসাই বললে,—আমাকে জান তুমি? আমি কালা গোঁসাই।—তা, কালিকেশ্বর শিবের পুজোয় তো কিছু দাও। খুব তো লোককে খাওয়ালে-দাওয়ালে।

একটা টাকা উনি দিলেন।

পরের দিন সকালে উনি বন্দুক বের করে সেটাকে পরিষ্কার

করছিলেন। কথা ছিল—ওখান থেকে দু-ক্রোশ দূরের বিলে শিকার করতে যাব।

কালা গোঁসাই এল। বললেন,—বন্দুক? শিকার?

উনি হেসে বললে,—হ্যাঁ। তোমার আবার কী খবর? কী মনে করে?

গোঁসাই বললে,—একনলা বন্দুক, কিন্তু কী রকম গড়ন? এটা কী? এরকম তো দেখিনি!

আমি বললাম,—ওটাতে টোটা পোরা থাকে—একসঙ্গে পাঁচটা। বারবার টোটা পুরতে হয় না। একসঙ্গে পর-পর গুলি ছোঁড়া যায়।

—আ! আচ্ছা! খুব ভাল বন্দুক। তুমি ছুঁড়তে পার?

—পারি—কিন্তু তোমার খবর কী গোঁসাই?

—তুমি খুব ভাল আদমি। তোমার কাছে এলাম। তুমি বাড়ি করবে শুনলাম?

—হ্যাঁ। কে বললে তোমাকে?

সে-কথার জবাব না দিয়েই গোঁসাই বললে,—নীরদ ঠিকাদারকে ঠিকা দিয়ো না তুমি।

—কেন?

—উঁহু। ওকে আমি বললাম শিবের দরবারে ঢুকবার পথের মুখে দুটো থাম বসিয়ে একটা ফটক বানিয়ে দাও। উ দিলে না। ওকে ঠিকা তুমি দেবে না। আমি তোমাকে রাজমজুর দোব—কাজ দেখে দোব। ভাল কাজ শস্তায় করে দেবে। তুমি শিবের দরবারে থাম ফটক বানিয়ে দেবে।

উনি বললেন,—আমি ওকে কথা দিয়েছি গোঁসাই। সে হয় না।

—না না। আমার কথা শুনতে হবে তোমাকে।

—তোমার কথা শুনতে হবে? উনি একটু চটে উঠলেন। কেন বল তো?

—আমি কালা গোঁসাই! বাবা শিবের হুকুম!

উনি ভুরু কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বললেন,—বিরক্ত কোরো না গোঁসাই ; যাও তুমি এখান থেকে। তুমি এখানে অনেক উপদ্রব করছ আমি শুনেছি। আমার নামও তুমি জান। আমি আজ সিনেমার কাজে বাইরে থাকি, কিন্তু এখানে আমি অনেক উপদ্রব বন্ধ করেছি। তুমি নিশ্চয় শুনেছ।

—আচ্ছা! কালা গোঁসাই উড়ে দাঁড়াল। তারপর বললে,—শিব তোকে দণ্ড নেবে। আমাকে দোষ দিস নে।

উনি হেসে বললেন,—কী হবে ? গা-ময় ঘামাচি ?

কালা গোঁসাই বললে,—নন্দীর ত্রিশূলের মুখে বন্দুক তোমার কথা বলবে না। এ আমি বলে দিলাম।

একটু চুপ করে রইল শিবনাথের স্ত্রী।

তারপর বললে,—ও কথাটা আমাদের কারুরই মনে ছিল না। কালা গোঁসাই মধ্যে-মধ্যে বাড়ির সামনে দিয়ে যেত আসত। কিন্তু আর ঝগড়া-টগড়া করেনি।

উনি হঠাৎ সেদিন টেলিগ্রাম পেয়ে চলে গেলেন। আমাকে বললেন,—একলা থাকতে পারবে তো ?

বললাম,—খুব পারব।

এত বড় গ্রাম, এ গ্রামে চুরি—তাও ধান চুরি কাপড় চুরি ঘাট থেকে বাসন চুরি ছাড়া আর কখনও কিছু হয়নি। ভয় বলতে অসুখের আর ভূতের। ওঁর ডাক্তার-বন্ধু রয়েছে, সকলে ভালবাসে, আর—ভূতের ভয় আমার নেই। তাছাড়া, ওঁর বন্ধুদের উনি বলে গেলেন।

আমি একাই বেড়ালাম দুদিন।

সেদিন ছিল বোধহয় পূর্ণিমার পরদিন। কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ, হয়ত-বা দ্বিতীয়া পড়ে থাকবে। পূর্ণিমার দিন থেকে আমাদের বাড়ির ইট আসছিল এখানে। ঠিকেদার নীরদবাবু আর দেবকুমারবাবু এসে বললেন,—চলুন বৌদি, ইট গুনে দেখব। আপনাকেও গুনতে হবে।

ইট গোনা হল। সন্ধে হয়ে গেল। পুবদিকে সোনার থালার মত চাঁদ উঠল। আমিই বললাম,—বসুন একটু। চাঁদ উঠছে, দেখি।

দেববাবু বললেন,—তাহলে গান শোনান।

অনুরোধ ঠেলতে পারলাম না, গাইলাম। দেখতে-দেখতে জ্যোৎস্নায় হেসে উঠল চারিদিক। সেই জ্যোৎস্নার মায়াতে যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। একখানার পর একখানা—আবার একখানা গাইলাম।

হঠাৎ এক ভয়ঙ্কর মূর্তি এসে সামনে দাঁড়াল। আমি চমকে উঠলাম।

দেববাবু ধমক দিয়ে বললেন,—কে ?

সে বললে,—আমি জটাধর, দেবুভাই।

—জটে ?

—হ্যাঁ। বলে, বসল সে। তারপর বললে,—এমন সুন্দর গান গায় আমাদের সীতা—তা, সে-পালাটা একবার করবে না? আমার সাধটা একবার মেটাবে না ?

দেববাবু বললেন,—পাগলামি করিসনে জটে—বাড়ি যা। আজ-কাল শুনি বাড়ি যাসনে, যেখানে-সেখানে মাঠে-ঘাটে পড়ে থাকিস ?

জটাধর বিড়বিড় করে বললে,—বাড়ি? বাড়ি? উঁহু! উঁহু! বাড়ি আমার কোথায় আবার? বললাম পালাটা করতে—তা—করবে না তোমরা, তা কোরো না।

তারপরই বক্তৃতা শুরু করলে,—কে রে? কে রে তুই কামাতুর—পাপাচারী নিষ্ঠুর পিশাচ! চলে গেল সে বাগানের ভিতর দিয়ে।

আরও একটা গান গেয়েছিলাম। তারপর ফিরলাম বাড়ি।

আমাদের বাড়ি যাবার একটা সোজা পথ আছে। সেটা গলিপথ। অন্যটা বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপের ভিতর দিয়ে। দরজাটা চণ্ডীমণ্ডপের দিকেই মুখ করে।

ওঁরা আমাকে চণ্ডীমণ্ডপের সামনে পৌঁছে দিলেন। আমি বললাম,—আর আসতে হবে না। ওঁরা চলে গেলেন। আমি চণ্ডীমণ্ডপে

ঢুকলাম। আমার শ্বশুরকুলের চণ্ডীমণ্ডপ। ওঁর ঠাকুরদাদাদের পাঁচ ভাইয়ের প্রতিষ্ঠা-করা পাঁচটি শিবমন্দির পাশাপাশি উঠেছে। লোক নেই জন নেই—খাঁ-খাঁ করছে। মন্দিরের প্রদীপগুলি নিভে গিয়েছে। শরিকরা গরিব হয়ে গিয়েছে। দেখলাম—শ্যাওলা-ধরা মন্দিরের গায়ে চাঁদের আলো পড়ে যেন লজ্জা পাচ্ছে—লজ্জা দিচ্ছে। উপরের কলস-গুলি কালো হয়ে গিয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, বাড়ি তৈরি আরম্ভ করবার আগেই এর সংস্কার করাতে হবে। কলসগুলি মাজাব, মন্দিরে চুনকাম করাব—

হঠাৎ পিছন থেকে কে আমার মুখ চেপে ধরলে। এক মুহূর্তে আশ্চর্য কৌশলে মুখ বেঁধে আমাকে তুলে ঘাড়ে ফেলে, গলিপথ ধরে ছুটল। অলিগলি তার জানা। কোন্ গলিপথ বেশি অন্ধকার, কোন্ গলিটা দুটো বাড়ির জল-পড়া নালা—সে সব জানে। ঐ নালাপথ ধরে সে ছুটল। আমি চিৎকার করতে পারছিলাম না। তার শক্ত মুঠোয় দুখানা হাত যেন আমার ভেঙে যাচ্ছিল। শুধু পাচ্ছিলাম গায়ে গাঁজার উৎকট গন্ধ।

অনেকটা পথ এসে সে এক জায়গায় আমাকে ফেলে দিলে।

জায়গাটা আবছা অন্ধকার। বড় গাছের ছায়াতল। সে আমাকে ফেলে দিয়ে হি-হি করে হেসে উঠল। দেখলাম, কালা গোঁসাই।

বীভৎস হাসি, কুৎসিত দৃষ্টি। সে বললে,—হাম কালা গোঁসাই! হাঁ! বন্দুক কোথা? বন্দুক? পাঁচটা গুলি পরপর চলে? হাঁ! সিনেমাওয়ালী—আজ তুম্‌কো লে-কে ভাগেগা হাম! হি-হি-হি! হি-হি-হি! হি-হি-হি!

সে হাসতেই লাগল।

আমি ভয়ে বোবা হয়ে গেলাম। শরীরে বল ছিল না আমার।

সে আমার হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। এমন সময় হঠাৎ একটা বিকট চিৎকার উঠল—বিকট চিৎকার করে অন্ধকার থেকে

প্রেতের মত একটা মূর্তি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল কালা গোঁসাইয়ের উপর,—কে-রে—কে-রে ?

দেখলাম—অতর্কিতে ধরলে সে কালা গোঁসাইয়ের গলার নলিটা চেপে। চিৎকার করতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম—সে জটে পাগলা। জটায়ুর বক্তৃতা করছে।

কালা গোঁসাই কথা বলতে পারছিল না। এক হাতে সে জটের হাত ছাড়াতে চেষ্টা করছিল, অন্য হাতে সে কোমর থেকে ছুরি বার করে তাকে মারবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু জটে-পাগলার নিষ্ঠুর আক্রোশ— নিষ্ঠুর বজ্রের মত শক্ত হাতের মুঠি। সে-যুদ্ধ নিষ্ঠুর যুদ্ধ। আমার মনে হল অমাবস্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল পৃথিবী। আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।

তারপর, তখন কত রাত্রি তা জানিনা। বোধহয় দু-প্রহর পার হয়েছে। আমার জ্ঞান হল। চাঁদ তখন মাথার উপর। জ্যোৎস্নার রঙ তখন নিটোল মুক্তোর মত ঝকঝকে সাদা। ঝলমল করছে চারিদিক। গাছের ফাঁক দিয়ে বাগানের অন্ধকারের মধ্যে টুকরো-টুকরো জ্যোৎস্না এসে পড়েছে। বাগানের ভিতর অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। তার মধ্যে দেখলাম—একদিকে পড়ে আছে কালা গোঁসাই, অন্যদিকে পড়ে আছে জটে পাগল।

হঠাৎ শিবনাথের স্ত্রীর চোখ থেকে গড়িয়ে এল দুটি জলধারা।

সে বললে,—জটে-পাগলা নয়, সে জটায়ু!

সকলে স্তব্ধ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। কল্যাণী বললে,—আমি বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়িতে ঝি-চাকর ভয় পেয়েছে। তারা জেগে বসে ছিল। আমি বললাম,—জ্যোৎস্না দেখছিলাম। উনি বাড়ি আসতে সব বললাম।

শিবনাথ বললে,—সৎকারের জন্য ওর শবটা আমি চাইতে এসেছি। ওর সৎকার করব আমি।

———

কাক-পণ্ডিত

কালো লম্বা মানুষটি—ঘোর কালো। গলায় পৈতা আছে বলিয়া বোঝা যায় ব্রাহ্মণ। নাম, যতীন চাটুজ্জে। পাঠশালার পণ্ডিত। লোকে বলে কাক-পণ্ডিত।

শুধু কালো বলিয়াই নয়। আরও কথা আছে ইহার মধ্যে। ছোট্ট একখানি চাষীর গ্রামের পাঠশালা ঐ যতীনই আসিয়া স্থাপন করিয়াছে। মূল জীবিকা—ব্রাহ্মণহীন চাষীর গ্রামে গ্রাম-দেবতার পূজা করা, ঘরে ঘরে ষষ্ঠী পূজা, লক্ষ্মী পূজা করা, মাঠে আখ-মাড়াইয়ের সময় শাল পূজা করা। যতীনকে এইজন্য লোকে প্রকাশ্যে বলে, যতীন ঠাকুর। বুদ্ধিমান যতীন অতঃপর ভাবিয়া-চিন্তিয়া পাঠশালা খুলিয়া বসিল। জমিদারের কাছারিতে পাঠশালা বসে। কয়েক বৎসরই পাঠশালা হইয়াছে। কিন্তু আজও পাঠশালার একটি ছাত্রও বৃত্তি পায় নাই। সেটা যতীনের অক্ষমতা নয়। সে ভাল ছেলে তৈয়ারি করিলেই পাশের গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিতরা জামা কাপড় বই টাকার লোভ দেখাইয়া ছেলেটিকে ভাঙাইয়া লইয়া যায়। এমন কয়েকটি ছেলেই অন্য পাঠশালা হইতে বৃত্তি পাইয়াছে। তাই তার কালো চেহারার সঙ্গে মানাইয়া লোকে তাহাকে বলে কাক-পণ্ডিত। কাকের মতই সে কোকিলের ছানা মানুষ করে, একদা সে-ছানা বড় হইয়া অন্যত্র গিয়া কুহু-কুহু করিয়া গান গাহিয়া চারিদিক মাতাইয়া দেয়। লোকে তারিফ করে।

পূজা এবং পড়ানো একসঙ্গে চলে যতীন চাটুজ্জের। সকালে

পূজা না হইলে দেব-সেবায় ত্রুটি হয়, আবার পাঠশালা—সেও সকালে না বসাইলে নয়। যতীন অতি সুকৌশলে দুই কাজ সারিয়া লইত। পাঠশালা বসাইয়া সে অপেক্ষা করিয়া থাকিত।

'পাখি সব করে রব'-এর পরেই বসিত তাহার পাঠশালা, এবং যেই দেখিত 'শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে' অমনি তেলের বাটি লইয়া বসিত। পাঠশালাতে বসিয়া তেল মাখাও চলিত, আর ছেলে-পড়ানোও চলিত। তারপর বলিত,—গ্রহণ কর, সব শেলেট গ্রহণ কর এইবার।

যতীন সাধু ভাষায় কথা বলে।

ছেলেরা স্লেট গ্রহণ করিলে বলিত,—আপন-আপন পাঠগুলি যত্নসহকারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে লিখে রাখ। আমি অবগাহন করে আসি।—আচ্ছা, ভোলা, অবগাহন শব্দের অর্থ কী, বল্ তো?

—আজ্ঞে, এমনি করে ডুব দেওয়া।

ভোলা কান দুইটি আঙুল দিয়া বন্ধ করিয়া বায়ু-সরোবরেই ডুব দিল।

যতীন ধাঁ করিয়া স্নান করিয়া আসে। জমিদারের কাছারিতেই পাঠশালা বসে। কাছারির প্রাঙ্গণে কয়েকটি জবা, আকন্দ ও কল্কে-ফুলের গাছ, গোটা-দুই বেলের গাছও আছে। কাপড় ছাড়িয়া যতীন কয়েকটা ফুল তুলিয়া লয়, অতঃপর বিল্বপত্র চয়ন করিবার পূর্বে কপালে হাত ঠেকাইয়া অদৃশ্য বৃক্ষবিহারীকে প্রণাম করিয়া তবে বিল্বপত্র চয়ন করে।

তারপরই হয় টিফিনের ছুটি।

সে বিল্ববাসিনীর ঘরে ঢুকিয়া প্রথমেই ভাঙা কাঁসরটা ঢন্-ঢন্ শব্দে বাজাইয়া দেয়। ছেলেরাও অমনি ছুটি পাইয়া কলরব করিতে-করিতে বাড়ি ছোটে।

যতীন পণ্ডিতের উপদেশ দেওয়া আছে,—গুড় সহযোগে মুড়ি অথবা যার পিতামাতা যা দেবেন, সন্তুষ্টচিত্তে প্রসন্নমনে তাই ভক্ষণ করবে। তারপর পিতার গাভী-দোহনের সময় গোবৎসটিকে ধৃত

করে পিতাকে সাহায্য করবে। গাভী-দোহনের পর আবার পাঠশালায় আগমন করবে। বুঝেছ?

ছাত্রদের পিতার গাভী-দোহন হইতে হইতে পণ্ডিতের পূজা শেষ হইয়া যায়। কাছারির বারান্দায় ছেঁড়া মোড়ায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে সে ছাত্রদের অপেক্ষা করে।

মণি মণ্ডলের ভগিনী ফুরি বিল্ববাসিনীর পূজার প্রদীপ ও ধূপ দেয়। এটি জমিদারের বন্দোবস্ত, মণি মণ্ডল ইহার জন্য জমি ভোগ করে। ফুরি বলে,—ঠাকুর রাস্তা থেকেই মন্তর বলতে বলতে আসে। পাঠশালার কাঁসর শুনেই আমি প্রদীপ সাজিয়ে ধূপের আগুন নিয়ে আসতে আসতে দেখি, ঠাকুরের পুজো শেষ হয়ে গিয়েছে।

ফুরি একদিন যতীনকে এ-কথা বলিয়াছিল। যতীন গম্ভীরভাবে তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিল,—ঈদৃশ বাক্য আর কখনও তুমি উচ্চারণ কোরো না, বুঝেছ?

ফুরি হাসিয়া সারা হইয়াছিল,—'ঈদৃশ বাক্য' কী গো? 'ঈদৃশ বাক্য'!—হি-হি-হি! 'ঈদৃশ বাক্য' কথাটি তাহার বড়ই কৌতুককর মনে হইল। ফুরি আড়ালে যতীনের নাম দিয়াছে, 'ঈদৃশ বাক্য'।

যাক সে কথা।

টিফিনের পর যে যতীন পাঠশালা লইয়া বসে, একেবারে পুরা তিনটি ঘণ্টা পড়াইয়া ছেলেদের ছাড়িয়া দেয়। পাঠশালার বড় ছেলেরা এই সময়টার নাম দিয়াছে 'কালবোশেখী'। বলে, কালবোশেখীর ঝড় আসছে! যতীন নিজেও সে-সময় ঘর্মাক্ত হইয়া উঠে। আপসোস করিয়া বলে, খদ্যোত কখনও গগনগাত্রে আরোহণ করতে পারে না। বৃথা চেষ্টা আমার। আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে,—পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে, ভাঙে হীরার ধার।

বলিয়াই ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া গবেষণায় নিযুক্ত হয়, ঐ 'ভেড়া' শব্দটি অত্যন্ত দুষ্ট প্রয়োগ হইয়াছে। মেষ বলিলে ক্ষতি কী ছিল?

গুরু-চণ্ডালী দোষ অমার্জনীয়। তার পর হইতে সে ভেড়ার শৃঙ্গে না বলিয়া, মেষের শৃঙ্গেই বলে।

*   *   *

সেদিন বিল্ববাসিনীর পূজা শেষ করিয়া মুড়ি এবং গুড় ভোজনান্তে হুঁকাটি হাতে পাঠশালাতে আসিয়া যতীন দেখিল, জমিদারের গমস্তা ও নগদী বসিয়া আছে। সে তাড়াতাড়ি গমস্তাকে আহ্বান করিয়া বলিল,—আসুন, আসুন, আসুন! আপনাদের সব মঙ্গল? শুভ সংবাদ তো সব?

যেন কাছারিটা তাহার নিজেরই বাড়ি।

গমস্তা বলিল,—হ্যাঁ সব মঙ্গল। তারপর, আপনার যে কাজ এসেছে সেইজন্যই এসেছি।

কল্কেটি গমস্তার নিকট নামাইয়া দিয়া বলিল,—কী কর্ম, ব্যক্ত করুন। পোঁটলা হইতে ছোট হুঁকাটি বাহির করিতে-করিতে গমস্তা বলিল,—বাবু আসছেন মহলে।

যতীন বলিল,—অহো ভাগ্য! সুসংবাদ, সুপ্রভাত হয়েছে অদ্য। গ্রামের সৌভাগ্যের বিষয়! জমিদার, ভূস্বামী, রাজা—

গমস্তা বাধা দিল, নতুবা জমিদারের আরও অনেক নাম সে বলিতে পারিত। গমস্তা বাধা দিয়া বলিল,—বিল্ববাসিনীর পুজো যখন নেন, তখনকার কথা মনে আছে তো? বাবু এলে পাক-শাক এখানে আপনাকেই করতে হবে। অবশ্য বাবু নিশ্চয় বকসিস দেবেন।

যতীন বলিল,—অবশ্য, অবশ্য। কর্তব্য কর্ম অবশ্য করণীয়, অবশ্যই আমি চালিত করে দেব।

এইটুকুর একটু ইতিহাস আছে। যতীন এ-গ্রামের বাসিন্দা নয়। এ-গ্রামে পূর্বে একঘর মাত্র ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারাই বিল্ববাসিনীর পূজা করিত এবং তাহার জন্য জমিদার-প্রদত্ত জমি ভোগ করিত। কিন্তু কিছুদিন পূর্বে সে ব্রাহ্মণ-বংশটি নির্বংশ হইয়া গিয়াছে। যতীন এ-গ্রামে পাঠশালা করিত, সে এই পূজারকত্বপদের প্রার্থী হইল।

তখনই কথা হয়, তাহাকে এই গ্রামে বাস করিতে হইবে, গ্রামের সকলের পৌরোহিত্যও করিতে হইবে এবং জমিদার অথবা তাঁহার কোন বিশিষ্ট প্রতিনিধি আসিলে তখন পাচকের কাজও করিতে হইবে।

যতীন তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়া কাজ গ্রহণ করিয়াছে। বিনিময়ে জমিদার-প্রদত্ত নিষ্কর আট বিঘা জমি সে পাইয়াছে। কাজ লইয়া পাঠশালা করিতে প্রায়ই বড় অসুবিধা হয়। গ্রামে কোন ক্রিয়া-কর্ম থাকিলে সেদিন আর পাঠশালা করা হয় না, অথবা পাঠশালা সারিয়া সে-কর্ম সারিতে গেলে বেলা তিনটা পর্যন্ত অনাহারে থাকিতে হয়। এবং গৃহস্থের তিরস্কার সহ্য করিতে হয় বিস্তার। কিন্তু তবু যতীন পাঠশালা ছাড়ে নাই। নানা কৌশলে সুবিধা-অসুবিধার একটা সমন্বয় সে করিয়া ফেলিয়াছে।

গমস্তা বলিল,—হ্যাঁ, সেইজন্যই বাবু রাঁধুনি-বামুন সঙ্গে আনবেন না।

যতীন একটু মাথা চুলকাইয়া বলিল,—দেখুন, একটু অসুবিধা হবে বলে অনুমান করছি। হুজুর হলেন সহরনিবাসী, দশ ঘটিকার সময় আহার করা অভ্যাস। কিন্তু আবার বিবেচনা করুন, বিল্ববাসিনীর পূজার্চনা, তৎপর পাঠশালার কর্ম—

ধমক দিয়া গমস্তা বলিল,—পাঠশালা এখন বন্ধ করে দেন। আর, বাবু এলে পাঠশালা করবেনই বা কোথায়? কাছারিতে তো এখন পাঠশালা করা যাবে না!

যতীন বলিল,—কিন্তু, মায়ের পূজা তো—

গমস্তা বলিল,—সে তো ন-টার মধ্যেই হয়ে যাবে। ন-টায় রান্না চড়ালে বারোটায় শেষ হবে। বাবু আমাদের বারোটার এদিকে খান না।

যতীন খুশি হইয়া বলিল,—অবশ্য, অবশ্য; দ্বাদশ ঘটিকা হল ঠিক মধ্যাহ্ন। মধ্যাহ্ন-ভোজন মধ্যাহ্নেই কর্তব্য। হুজুর আমাদের মহদ্বংশোদ্ভূত মহৎ ব্যক্তি।

—হ্যাঁ, কাল হতে পাঠশালা আপনি ছুটি দিয়ে দেন। কাছারিতে কলি ফেরাতে হবে। তারপর নগদীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—কাঠ কেটে চেলা করে রাখ্। একটা বড় দেখে ডাল কারও গাছ থেকে কেটে নে।

যতীম বলিল,—হ্যাঁ বৎস। শাখাটি যেন বেশ শুষ্ক হয়। ভিজা কাষ্ঠ হলে ধূম্রে ধূম্রে অন্ধ হয়ে যেতে হবে। তিন্তিড়ী-শাখা হলেই উত্তম হবে। এরূপ দাহ্য কাষ্ঠ আর হয় না।

নগদী বলিল,—কার গাছের ডাল নে'ব ?

বিরক্ত হইয়া গমস্তা বলিল,—যার পাবি তারই নিবি। তাই তেঁতুল-ডালই একটা যার থেকে হোক কেটে নে।

যতীন জোড়হাত করিয়া বলিল,—এইসঙ্গে কয়েকটি বংশখণ্ড ছেদনের আদেশও ওকে দিতে হবে।

গমস্তা বলিল,—আপনার মশাই কোন্ সময় কোন্ তাল! কেন, বংশখণ্ড নিয়ে কী করবেন ? ঘর তো আপনার ছাওয়ানো হয়ে গিয়েছে।

যতীন বলিল,—আজ্ঞে, তোরণ নির্মাণ করব; হুজুর যেদিন পদার্পণ করবেন, সেদিন পত্রপুষ্প দিয়ে সুসজ্জিত করব।

গমস্তা বলিল,—তাই দিস রে, গোটা-আষ্টেক বাঁশ কেটে ঠাকুরকে দিস।

ছাত্রেরা তখন সব আসিয়া গিয়াছে, তাহারা শুনিতে শুনিতে খুশি হইয়া উঠিল—ছুটি, ছুটি; 'কালবোশেখী' হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

যতীন এইবার ছেঁড়া মোড়াটিতে বসিয়া আরম্ভ করিল,—ছকু, তুমি ভূস্বামী বানান কর তো ?

ছকু নির্ভুল উত্তর দিল।

—হরিচরণ, ভূস্বামী শব্দের অর্থ কী ?

হরিচরণ বলিতে পারিল না। হরিচরণের পর একে-একে সকল

ছাত্রকেই প্রশ্ন করা হইল, কিন্তু কেহই উত্তর দিতে পারিল না। তখন যতীন বলিল,—মরিরাম, তুমি এ-প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পার?

শীর্ণকায় টলটলে মুখে মরিরাম গলায় এক-বোঝা মাদুলি লইয়া উঠিয়া বলিল,—আজ্ঞে, ভূস্বামী মানে—রাজা, জমিদার।

যতীন খুশি হইয়া বলিল,—আমার নিকটে আগমন কর।

মরিরাম তাহার নিকটে আসিল। যতীন তাহার শীর্ণ দেহে হাত বুলাইয়া বলিল,—উত্তম, যথার্থ উত্তর প্রদান করেছ। তারপর সে ছেলেদের জমিদার কে এবং কী বুঝাইতে আরম্ভ করিল। ছেলেরা কালবোশেখীর হাত এড়াইয়া জমিদারের দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছিল। বক্তৃতা-শেষে যতীন বলিল,—আগামী কল্য হতে বিল্ববাসনী মায়ের প্রাঙ্গণে ঐ বৃক্ষচ্ছায়াতে পাঠশালা চালিত হবে। এবং প্রাতঃকালের পরিবর্তে অপরাহ্ণ দুই ঘটিকা হতে পাঁচ ঘটিকা পর্যন্ত হবে।

ছেলেরা পাংশুমুখে এ-উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

যতীন আবার বলিল,—হৃদয়ঙ্গম হয়েছে সব?

সকলে ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, হইয়াছে। মরিরাম ছেলেটি মৃদুস্বরে বলিল,—আমাকে তাহলে কখন পড়াবেন?

মরিরামকে যতীন পৃথকভাবেও পড়াইয়া থাকে, সে সময়টা ঐ দুই ঘটিকা হইতে চার ঘটিকা পর্যন্ত নির্দিষ্ট আছে।

যতীন একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—তুমি বৎস অতি প্রত্যুষে আমার গৃহে আগমন করবে। ছয় ঘটিকা হতে আট ঘটিকা পর্যন্ত তোমার পাঠাভ্যাস করিয়ে দেব।

ছেলেটিও খুশি হইয়া চলিয়া গেল।

জমিদারবাবুটি এ-যুগের মানুষ এবং শিক্ষিত ব্যক্তি। তবুও তোরণ-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া তিনিও ঈষৎ পুলকিত না হইয়া পারিলেন না। আবার কাছারিতে গিয়া একখানি টিনের চেয়ারে বসিতেই কতকগুলি ছেলে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

তারপর সারি দিয়া দাঁড়াইয়া কাছারির দিকে স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সুর করিয়া আরম্ভ করিল:

বারংবার প্রণিপাত চরণে তোমার।
হে মহতোমহীয়ান করুণা অপার॥
প্রজার পালনে তুমি রামের সমান।
বিদ্যার সাগর তুমি জ্ঞানী গুণবান॥

এবার জমিদারবাবুটি হাসিয়া বলিলেন, বেশ, বেশ, কে শেখালে এসব তোমাদের?

যতীম আসিয়া হেঁট হইয়া নমস্কার করিয়া বলিল,—আজ্ঞে, অধম হুজুরের আশ্রিত ব্যক্তি। বিশাল মহীরুহে কত পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ আশ্রয় গ্রহণ করে: বৃক্ষ সকলকে জ্ঞাত হয় না। অধীনও তদনুরূপ একটি কীট-পতঙ্গ।

গমস্তা মুচকি হাসিয়া বলিল,—উনি হলেন যতীন ঠাকুর, বিল্ববাসিনী মায়ের পুজো করেন আর পাঠশালায় পণ্ডিতি করেন।

জমিদারবাবু নমস্কার করিয়া বলিলেন,—বেশ, বেশ, আপনি তাহলে পণ্ডিতমশায়! বাঃ, আপনার কথাগুলি বড় চমৎকার। সুন্দর শুদ্ধ। বাঃ বেশ!

পণ্ডিত সম্বোধনে এবং এমন অজস্র প্রশংসাবাদে যতীন, যাহাকে বলে পরম পুলকিত, তাই হইয়া উঠিল; পুলকের আতিশয্যে তাহার চোখদুটি ছল-ছল করিয়া উঠিল। সে হাত জোড় করিয়া বলিল,—হুজুর মহৎ, অধীন ক্ষুদ্র। কিন্তু হুজুর বিবেচনা করে দেখুন, আমি ব্রাহ্মণ, শিক্ষকতা আমার কর্ম। হুজুর, আমি যদি অশুদ্ধ ভাষায় কথোপকথন করি, কিংবা ব্যাকরণ-দুষ্ট শব্দ প্রয়োগ করি, তবে আমার ছাত্রেরা কিরূপে শুদ্ধ এবং সাধু ভাষায় জ্ঞান লাভ করবে? যদি কেহ স্বর্ণালঙ্কারের পরিবর্তে অহরহ পিত্তলের অলঙ্কারই ব্যবহার করে, তবে পিত্তলকেই সে স্বর্ণ বলে জ্ঞান করে।

গমস্তা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সে বলিল,—যান গো এইবার, যান ; রান্না চড়িয়ে দেন গিয়ে।

যতীন বলিল,—হ্যাঁ, এই যে আমি প্রস্তুত। অবিলম্বেই রন্ধন সমাপ্ত হয়ে যাবে। কোন চিন্তা নাই।

জমিদার বলিলেন,—আপনিই রান্না করবেন নাকি ?

—হ্যাঁ হুজুর ! হুজুরের আশ্রিত আমি, তদুপরি মহা ভাগ্য আমার, নতুবা আমার হস্তের রন্ধনে হুজুরের সেবা হবে কেন ? বলিয়া সে একখানি দরখাস্ত হুজুরের হাতে দিল। দরখাস্তখানি পড়িবার পূর্বেই সেখানির দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়াই জমিদার মুগ্ধ হইয়া গেলেন। হাতের লেখাটি অতি সুন্দর, প্রথম দৃষ্টিতে ছাপা লেখা বলিয়াই ভ্রম হয়। সপ্রশংস দৃষ্টিতে যতীনের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—আপনার লেখা ? বাঃ, অতি সুন্দর লেখা, এত সুন্দর লেখা আমি কখনও দেখি নি !

যতীন আবার আরম্ভ করিল,—হুজুর, হস্তলিপি সুন্দর না হলে শিক্ষকতা করা চলে না। কারণ, ছাত্রগণ গুরুর হস্তলিপিকেই আদর্শ জ্ঞান করে সেইরূপ লিখবারই চেষ্টা করে। তদ্ব্যতীত, চিন্তা করে দেখুন হুজুর, অগ্রে লেখা, তৎপরে পড়া। সেইজন্যই লেখাপড়া শব্দ প্রচলিত হয়েছে।

দরখাস্তখানি হুজুর পড়িতেছিলেন, প্রথমেই যতীন আরম্ভ করিয়াছে—মহামহিম মহিমার্ণব জ্ঞান-গুণ প্রভৃতি অশেষ সদ্‌গুণ-সমলঙ্কৃত প্রজাপালক ভূস্বামীপ্রবর শ্রীল শ্রীযুক্ত……মহোদয় অশেষ প্রবলপ্রতাপেষু। তাহার পর দীর্ঘ তিন পৃষ্ঠা ধরিয়া গ্রামের পাঠশালাটির দুরবস্থার বর্ণনা করিয়া হুজুরের করুণাদৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।

জমিদার প্রশ্ন করিলেন,—সরকারি সাহায্য কত করে পান ?

—এক কপর্দকও নয় হুজুর।

—কেন ?

—আমি যে 'জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী' পাশ নই হুজুর।

জমিদার বিস্মিত হইলেন। যতীন সবিনয়ে বলিল,—ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন অধীনের, রহস্য করে ও-বাক্যটি আমি প্রয়োগ করেছি। গুরু ট্রেনিংকে বলা হয় জি. ও. টি.। রহস্য করে আমরা বলি—জেঠি, জ্যেষ্ঠতাত-পত্নী।

জমিদার হাসিয়া বলিলেন,—বুঝেছি। আচ্ছা, আমি বরং সেজন্য চেষ্টা করব।

যতীন বলিল,—হুজুর, আক্ষেপের বিষয় আর কত নিবেদন করব, আমার পাঠশালার ছাত্রকে বৃত্তি-পরীক্ষা দিতেও অনুমতি দেওয়া হয় না। আমার শিক্ষকতার কৃতিত্ব দেখাতে পেলাম না। নতুবা আমি অহঙ্কার সহকারে বলতে পারি, আমার ছাত্র প্রত্যেক বারেই বৃত্তি-পরীক্ষাতে কৃতকার্য হত; এবং সেইজন্যই আমি যাদের শিক্ষিত করে তুলি, তাদেরই গ্রহণ করে অবশেষে লোকপাড়ার বিদ্যালয় বৃত্তি-পরীক্ষায় সুনাম অর্জন করে। বর্তমান বৎসরে মরিরাম নামক একটি বালক আছে হুজুর, তাকে হীরকখণ্ড বলা যায়। যদি কোনরূপে অনুমতি পাই হুজুর—

নগদীটা উনানে আগুন দিয়াছিল, সে বাধা দিয়া ডাকিল—কাঠগুলা পুড়ে যে হুদ্দুড় হয়ে গেল মশায়!

যতীন ব্যস্ত হইয়া বলিল,—এই যে আমিও আগমন করছি। তুমি হরিদ্রা, লঙ্কা, আদ্রক প্রভৃতি মসল্লাগুলি বণ্টনের ব্যবস্থা কর দেখি।

রান্নাঘরের দাওয়া হইতে গমস্তা বলিল,—বণ্টনের ব্যবস্থা হয়েছে, এখন আপনি আগমন করুন দেখি। হুজুর তো এখন রইলেন, পরে ওসবের ব্যবস্থা হবে।

যতীন রান্নাশালে আসিতেই নগদীটা বলিল,—তুমি কিন্তুক আচ্ছা বকতে পার মশায়! বকে-বকে মানুষের কানের পোঁকা মেরে ফেলাও! আঃ, সে কাল থেকে লেগেছ বাপু!

যতীন চোখ মুছিয়া বলিল,—তুমি কী বুঝবে বৎস! কথিত

আছে, মহতের ধর্ম মহতে জানে, মহতের টান মহতে টানে। তোমার অবশ্য অপরাধ কী?

*　　　　*　　　　*

জমিদারটিকে যতীনের বড় ভাল লাগিয়াছে। গমস্তা, নগ্দী, বাবুর চাপরাশি—সকলেই যতীনকে শাসন করে, কিন্তু বাবুর ব্যবহার বড় মিষ্ট, কখনও কটু কথা বলেন না। গমস্তা, নগ্দী, চাপরাসির ব্যবহারে যতীন দুঃখিত নয়, সে মনে মনে তাহাদের করুণা করে, একান্ত নির্জনে সে আপন মনেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে, অজ্ঞতার মত দুষ্ট ব্যাধি আর সংসারে নাই।

প্রত্যহ প্রভাতে সে একটি করিয়া সমস্যা আনিয়া জমিদারবাবুর নিকট উপস্থিত করে। করজোড়ে দাঁড়াইয়া বলে,—হুজুর অভয় দিলে অধীন একটি নিবেদন পায়।

বাবুর হাসির মধ্যেই অভয় ফুটিয়া উঠে। যতীন বলে,—একটি সমস্যার সমাধান কবে দিতে হবে হুজুরকে। হুজুর, এই সংসারের মধ্যে একদা অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের মধ্যে বিবাদ হয়েছিল। অদৃষ্ট বলে, আমি শ্রেষ্ঠ আমি বলবান; পুরুষকার বলে, আমিই শ্রেষ্ঠ আমিই বলবান। এইটুকুই অবগত হয়েছি, মীমাংসার সংবাদ আমি জানি না। মীমাংসা হুজুরকে করে দিতে হবে।

বাবু শিক্ষিত ব্যক্তি, তিনি বলিলেন,—মীমাংসা এখনও হয়নি পণ্ডিতমশাই। বিবাদ এখনও চলছে, কাজেই মীমাংসার খবর কেমন করে দেব আপনাকে?

বাবুর উত্তরে যতীনের চমক লাগিয়া যায়, সে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে ফিরিয়া আসিয়া কথাটি ভাবিতে বসে। কিন্তু ভাবিয়াও বুঝিতে পারে না। তবুও কথাটা তাহার বড় ভাল লাগিয়াছে। সে মনে-মনে কথাগুলি মুখস্ত করিয়া ফেলে। ভাবিয়া-চিন্তিয়া 'খবর' শব্দটির পরিবর্তে সংবাদ শব্দটি বসাইয়া শুদ্ধ করিয়া লয়।

সেদিন আসিয়া প্রশ্ন করিল,—হুজুর, জ্ঞান শ্রেষ্ঠ অথবা ভক্তি শ্রেষ্ঠ?

বাবু বলিলেন,—ও-দুটোর হল, আম আর আঁটির মত সম্বন্ধ পণ্ডিতমশাই! আম খেলেই যেমন আঁটি পাওয়া যায়, জ্ঞান এলেই তেমনি ভক্তি আসে। অবশ্য ভুয়ো আঁটিওয়ালা আমও আছে, সেটা ঐ আমের শাঁস শুকিয়ে যায় বলেই। সে আপনার অখাদ্য।

পণ্ডিতের তাক লাগিয়া গেল। সে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছিল। অকস্মাৎ রান্নাশালা হইতে গমস্তার তীব্র কণ্ঠস্বরে সচকিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

গমস্তা তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল,—বলি, ব্যাপার কী আপনার বলুন তো?

পণ্ডিত সভয়ে বলিল,—কী আজ্ঞে?

—এই পরশু দোকান থেকে সাতদিনের জিনিসপত্র আনিয়ে দিয়েছি। একসের ঘি এসেছে। এর মধ্যে আজ ঘি নাই, জিনিসপত্রও সব ফুরিয়ে গেল, ও-বেলায় আর চলবে না—এর মানে কী?

যতীন হাতজোড় করিয়া বলিল,—আজ্ঞে আমি বেশ অনুধাবন করতে অপারগ হচ্ছি, কিরূপে অর্থ ব্যক্ত করব বলুন!

গমস্তা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল,—ও-সব 'ব্যক্ত-মেক্ত' ছাড়ুন মশাই, সাদা কথায় বলুন······

ওদিকে কাছারি হইতে বাবু ডাকিলেন, রাধাচরণ!

গমস্তা কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই তাড়াতাড়ি বাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বাবু বলিলেন,—বকাবকি কিসের হচ্ছে? কী হল?

—আজ্ঞা, মহা বিপদ হয়েছে। জিনিসপত্র সব চুরি যাচ্ছে।

—চুরি যাচ্ছে? কী চুরি গেল?

—আজ্ঞে, পরশু দোকান থেকে হিসেব করে সাতদিনের মত জিনিসপত্র আনিয়েছি। ঘি আনিয়েছি পাকি একসের। আজ আর জিনিসপত্র কিছুই নাই। ঘি ছটাকখানেক মাত্র পড়ে আছে। ও-বেলায় সব আসবে তবে রান্না চড়বে।

যতীনও পিছন পিছন আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে সম্মুখে

আসিয়া বলিল,—হুজুর, তস্কর যে কে, অনুসন্ধান করে দেখা হোক। আমি অদ্য হতে কাছারি ত্যাগের সময় বস্ত্র অঙ্গ উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়ে যাব হুজুর!

বাবু বলিলেন,—না-না-না। যান আপনি, কাজ করুনগে যান।

ধমক দিয়া গমস্তা বলিল,—যান না মশাই, বাবু বললেন যেতে আর আপনি আবার আরম্ভ করলেন?

যতীন চলিয়া গেল।

গমস্তা বলিল,—হয় ও, নয় ঐ নগদী বেটার কাজ।

বাবু বলিলেন,—বেশ তো, জিনিসপত্রে একটু নজর রাখ, তাহলেই আর চুরি যাবে না। আর ও নিয়ে কি কেলেঙ্কারি করে? ছিঃ!

গমস্তা আপন মনেই বক্ বক্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পর বাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যতীন ম্লানমুখে নির্বাক হইয়া বসিয়া আছে। কত গভীর চিন্তায় সে যেন মগ্ন। তিনি বুঝিলেন, কথাটা বেচারাকে বড়ই বাজিয়াছে। তাঁহারও মনটা বেদনায় টন্ টন্ করিয়া উঠিল। তিনি তাহাকে উৎসাহিত করিবার জন্যই বলিলেন,—পণ্ডিতমশাই, একদিন আপনার পাঠশালা দেখব আমি।

পণ্ডিত তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—সে সৌভাগ্য কি আর অধীনের অদৃষ্টে আছে?

বাবু বলিলেন,—ওকথা কেন বলছেন? নিশ্চয় যাব আমি।

একটুখানি স্তব্ধ থাকিয়া যতীন বলিল,—হুজুর সেদিন ব্যক্ত করলেন অদৃষ্ট আর পুরুষকারের দ্বন্দ্বের আজও অবসান হয় নাই। কিন্তু আমার মনে হয় হয়েছে। অদৃষ্টই শ্রেষ্ঠ, সে-ই বলবান।

বাবু যতীনের এই আকস্মিক উত্তরের হেতু বুঝিয়াছিলেন, তাই একান্ত আন্তরিকতাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে বলিলেন,—না-না-না, কিছু মনে করবেন না আপনি। ওসব লোকের বিষয় ঘেঁটে-ঘেঁটে মনে ঘাঁটা

পড়ে গেছে, আর সংসারে পাপ ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না ওদের। আমি আপনার কাছে মাপ চাচ্ছি।

যতীনের চোখ দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িয়া গেল।

বাবু আর সেখানে দাঁড়াইলেন না। পাছে যতীনের উচ্ছ্বাস প্রবলতর হইয়া উঠে সেই ভয়ে তিনি ঘরে আসিয়া বসিলেন। মিনিট-দশেক পরেই কিন্তু যতীন আসিয়া বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইল,—হুজুর!

—বলুন।

যতীন জোড় হাত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। বাবু দেখিলেন, তাহার ঠোঁট দুইটা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে।

তিনি গভীর সহৃদয়তার সহিত বলিলেন,—কী বলছেন বলুন!

যতীন ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া তাঁহার পা দুইটা ধরিয়া বলিল, হুজুর, আমিই অপরাধী, আমিই তস্কর! ঘৃত মসল্লা—আমিই অপহরণ করেছি হুজুর!

বাবু নির্বাক হইয়া রহিলেন। যতীন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছিল। বাবু সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—আপনার বড় অভাব, নয়?

যতীন বলিল,—হুজুরের আশীর্বাদে অধীনের অভাব নাই হুজুর। তবে, এই বালকটির জন্য। দরজার বাহির হইতে শীর্ণকায় মরিরামকে সম্মুখে আনিয়া বলিল,—হুজুর, বড়ই মেধাবী ছাত্র এটি। কিন্তু সংসারে বড়ই অভাব; আমাকে কিছু-কিছু করে সাহায্য করতে হয়। নতুবা উদরের দায়ে বালকটিকে পড়া পরিত্যাগ করে কারও গো-চারণ চাকুরি গ্রহণ করতে হয়।

বাবুর বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

যতীনের আবেগ তখনও নিঃশেষিত হয় নাই, সে বলিল,—তাই হুজুর আপনার দরবার হতে কিছু মসল্লা একে প্রদান করেছি। আর ঘৃতটুকু, হুজুর, ঐ ওকেই সেবন করতে দিয়েছি,—মেধাবী ছাত্র, ঘৃতে মেধা বৃদ্ধি হয়। হুজুর, ওকে এবার আমি বৃত্তি-পরীক্ষা যেমন করে

হোক দেওয়াব! আমার ছাত্র নিয়ে লোকপাড়ার শিক্ষকেরা সুনাম অর্জন করে, আর আমায় বলে,—'কাক-পণ্ডিত'। হুজুর, আমি শিক্ষিত করি আর তারা অবশেষে তাকে গ্রহণ করে তাই……

আবার সে ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। ছেলেটিও ইতিমধ্যে প্রণাম সারিয়া বড় বড় চোখদুটি মেলিয়া করজোড়ে বাবুর সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল।

বহুক্ষণ পরে বাবু বলিলেন,—আচ্ছা পণ্ডিত, আমি এখন থেকে ছেলেটিকে মাসে এক টাকা করে সাহায্য করব। বুঝলেন ?

যতীন করজোড়ে প্রশ্ন করিল,—আর, পাঠশালা কবে পরিদর্শন করবেন হুজুর ? আমি পত্রপুষ্প দিয়ে সব সুসজ্জিত করব। হুজুর, আপনি যে ভূস্বামী, রাজা, দেবতার অংশ—

যতীনের উচ্ছ্বাস থামিত কি না সন্দেহ, কিন্তু নগদীটা চিৎকার করিয়া ডাকিল,—অ্যাই-যাঃ, ডালটা পুড়ে গেল যে! ঠাকুরমশাই, ও ঠাকুরমশাই!

সত্যই পোড়া গন্ধ উঠিয়াছিল, যতীন ত্রস্তপদে রান্নাশালার দিকে চলিয়া গেল।

———

গবিন সিংয়ের ঘোড়া

গবিন সিং পশ্চিম দেশের ছত্রী—গোঁফ গালপাট্টা আর লম্বা লাঠি নিয়ে বাংলা দেশে চাকরি করতে এসেছিল। এসে এমনি লাগল ভাল দেশটা যে, এ-দেশেই সে বাস করে ফেললে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে এল, বাড়ি-ঘর করলে, সঙ্গে-সঙ্গে কিনলে এক ঘোড়া। ছত্রীদের ঘোড়া হল ইজ্জৎ। আগেকার কালে ছত্রীদের ছিল প্রকাণ্ড বড় ঘোড়া আর তলোয়ার। এ-যুগে তলোয়ার গেছে, লাঠি ধরতে হয়েছে। ঘোড়াটা আছে, কিন্তু বড় থেকে ছোট হয়ে এসেছে।

গবিন সিং বলত,—নসিব। কপালে হাত দিত।

তারপর বলত,—রংরেজ। ঐ সাদা-চামড়া ফিরিঙ্গি-রংরেজ।

লোকে হাসত।

গবিন সিং ছেলের নাম রেখেছিল নবীন। বাংলা দেশেই নবীনের জন্ম, তাই।

এদেশের বাপ ছেলেতে, ভাইয়ে ভাইয়ে নামের মিল রাখার রেওয়াজ মতই নাম রেখেছিল। গবিনের ছেলে নবীন। লোকে তার বুড়ো ঘোড়াটার নাম দিয়েছিল প্রবীণ। গবিনও হেসে ফেলত, বলত,—ইয়ে বাংগালী লোক আরেঃ বাপ্! মগজ বহুৎ সাফা! এইসা ঝাটসানি ছড়া বনা দেতা! হায় হায়!

প্রবীণ ছোট হলে কী হবে—গুণ অনেক। গবিনের অবস্থা বোঝে; ঘরে খায় না, চরে খায়,—সকালবেলা ঘর থেকে বার হয়েই গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে ক্ষুরে ক্ষুরে খপখপ শব্দ তুলে ছুটে বেরিয়ে যায়।

সামনে লোকজন থাকলে নিজেই চিঁ-হি-হি করে চেঁচিয়ে উঠে বলে—হট্ যাও! হট্ যাও!

লোকেরা বলে,—ঐরে, প্রবীণ আসছে! তারা সরে দাঁড়িয়ে পথ দেয়। বুড়ি বা বুড়ো পথে পড়লে প্রবীণ নিজেই পাশ কাটিয়ে চলে যায় বা থমকে দাঁড়ায়। তারা চলে গেলেই আবার ছুটতে আরম্ভ করে—খপ্ খপ্, খপ্ খপ্। একেবারে গাঁ পেরিয়ে মজা দিঘিটায় গিয়ে নামে, সেখানে ঘোড়াদাম নামে ঘাস প্রচুর জন্মায়, তাই খায়। ঠিক সন্ধের সময় ফিরে নিজের চালাটার সামনে দাঁড়িয়ে চিঁ-হি-চিঁ-হি শব্দ করে। শব্দ করে সে ডাকে। কাউকে আসতেই হবে—হয় গবিনকে, নয় নবীনের মাকে। বলতে হবে,—এসেছিস?

প্রবীণ অমনি ঘাড়টা লম্বা করে মুখটা কাছে নিয়ে আসবে, সেখানে কয়েকটা আদর করে চাপড় মারতে হবে—বাস। তাহলেই হল। প্রবীণ খুশি হয়ে চালায় গিয়ে ঢুকবে। তা না হলে কিছুতেই চালায় ঢুকবে না, চিঁ-হি-চিঁ-হি ডাকতেই থাকবে, তাতে বিরক্ত হলে বিপদ। চাবুকই মারো আর চেলা কাঠ দিয়েই পেটো, সে ডাকতেও থামবে না, ঘরেও ঢুকবে না, পালিয়েও যাবে না। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে আর চেঁচাবে।

গবিন সিং মধ্যে মধ্যে এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে যায়। বাবুদের বাড়ির চাকরি ছেড়ে সে এখন টাকা দাদনের ব্যবসা করে। চাষীদের টাকা ধার দেয়। দলিল না, খত না—শুধু-হাতে দেয়, আদায়ের সময় ঘোড়ায় চেপে গিয়ে বাঁ হাতে লাঠি ধরে ডান হাত পাতে—দাও টাকা। টাকায় মাসে দু-পয়সা সুদ,—মাস-মাস সুদ চাই, মেয়াদ অন্তে টাকা চাই। আজ টাকাটা নিয়ে ফের কাল নাও তা দেবে গবিন সিং, কিন্তু কথার খেলাপ অর্থাৎ ঠিক দিনে টাকাটা না পেলে সর্বনাশ। দিনগুলো গবিন সিংয়ের মুখস্থ থাকে। ঠিক দিনে সে ঠিক হাজির হবে। খেয়ে-দেয়ে সাদা চাদরের পাগড়ি বেঁধে, ছোট লাঠি হাতে তৈরি হয়ে নবীনকে বলে,—নবীনোয়া, বোলাও তো পরবীনোয়াকো!

নবীন গাঁয়ের ধারে এসে হাঁকে বিচিত্র সুরে—আ-আ-আ ওঃ!

প্রবীণ কান খাড়া করে শুনে মজা দিঘি থেকে উঠে খপ্ খপ্ করে ছুটে এসে নবীনের সামনে দাঁড়ায়। নবীন প্রবীণের গলাটা ধরে পিঠে উঠে পড়ে, চুল মুঠোয় চেপে ধরে লাগামের মত। প্রবীণ সটান এসে ওঠে বাড়িতে। গবিন তার পিঠে কম্বল বেঁধে মুখে লাগাম এঁটে চড়ে বসে। প্রবীণ চলতে আরম্ভ করে ঠুক্ ঠুক্ করে। এটুকুও প্রবীণের একটা গুণ। গবিন বলে,—আরে মশা, পরবীন সমঝে সব। ভরতি-পেটমে দৌড়েগা তো হামারা তকলিফ্ হোগা!

লোকে বলে,—কিন্তু আসবার সময়? তখনও তো সেই ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্!

—হাঁ-হাঁ। পাকিটমে টাকা থাকে, কাঁধমে তরকারি-উরকারি থাকে, ঝম্ঝমাবে নেহি! গির্ যাবে নেহি! পরবীন সব সম্ঝে মশা।

গাঁয়ের ছেলেরা গবিন সিংয়ের কথাকে সমর্থন করে। ওরা প্রবীণের তেজস্বিতার সঙ্গে পরিচিত। মধ্যে-মধ্যে ওরা দল বেঁধে দিঘির ধারে যায়, প্রবীণের পিঠে চড়ে তেপান্তরের মাঠে ছুট দেবার জন্য। ওদের দিঘির পাড়ে দেখলেই প্রবীণ ঘাড় উঁচু করে দাঁত বের করে শুরু করে চিঁ-হি চিঁ-হি!

ছেলেরা কিন্তু ওতে ভয় পায় না। ওরা তাড়া দিতে থাকে। প্রবীণ কামড়াতে আসে। ওরা খুব চতুর, দূর থেকে বিচিত্র কৌশলে নানা দিক থেকে ওকে বিভ্রান্ত করে মাথার চুল এবং কান চেপে ধরে দড়ি দিয়ে বাঁধে। তারপর তারা পালা করে চাপে। চাপামাত্র প্রবীণ সামনের জোড়া পা তুলবে, তাতে সওয়ার না পড়লে প্রবীণ পিছনের পা ছুড়বে, আবার সামনের পা তুলে দাঁড়াবে। শেষ পর্যন্ত ছুটবে—ছুটে গিয়ে গাছের গুড়িতে গা ঘেঁসে দাঁড়াবে। অর্থাৎ সওয়ারের পা-খানাকে টিপে ধরবে গাছ ও নিজের পেটের সঙ্গে। সওয়ার পড়লেই সে তখন প্রচণ্ড বেগে ছুটবে প্রান্তরের মধ্যে।

চক্রাকারে সার্কাসের ঘোড়ার মত ছুটবে। ছেলেরাও ছুটবে তাকে আবার ধরবার জন্য।

কিন্তু এ মজা-দিঘির ঘাসে ভরা কাদামাটি নয়, শক্ত মাটির ডাঙা, এখানে প্রচণ্ড দৌড়োয় প্রবীণ। ছেলেরা ক্লান্ত না-হওয়া পর্যন্ত থামে না। ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে বসলে সে দাঁড়ায়, চিঁ-হি-চিঁ-হি করে—সম্ভবত ওদের মুখ ভেংচে আবার চলে যায় দিঘির দিকে।

ছেলেরা বলে,—তীরবেগে দৌড়তে পারে প্রবীণ। কিন্তু ভারি পাজি। কলকাতার ঘোড়দৌড়ের কথা শুনেছে তারা। তারা বলে,—যা ছোটে, কলকাতার ঘোড়দৌড়ে প্রবীণ ফাস্টো হতে পারে।

কিন্তু কে চাপবে? গবিন সিংয়ের পেট কব্ কব্ করে, সে চড়লে প্রবীণকে আস্তে হাঁটতে হবে। ছেলেরা চাপলে সামনের পা তুলবে, পেছনের পা ছুঁড়বে, দেওয়াল ঘেঁষে সওয়ারকে ঘেঁষটে দেবে। ততক্ষণে বাকি ঘোড়ারা মেরে দেবে বাজি।

এক পারে নবীন। নবীন শুধু পিঠের উপর উঠে ঘাড়ের চুলের মুঠোটি ধরলেই প্রবীণ ছুটবে—যেন পক্ষীরাজ!

ছেলেবয়সে নবীন পুলকিত হত। কিন্তু ক্রমশ বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে সে লজ্জিত হতে আরম্ভ করলে। তার বাপ তাকে পরবীনোয়াকে বোলাইতে বললে সে বলত,—আমি পারব না।

বাপ বলত,—কাহে?

ছেলে বলত,—না। পেটমোটা একটা বিশ্রী ঘোড়া।

—পেটমোট্টা! বিস্মিত হত গবিন সিং। কী হল তাতে? সে বলত,—পেটমোট্টা তো কী হয়েছে? ইয়ে তো দেশকে দস্তুর। বাংগালকা পানিমে পেটমোট্টা হোতা হ্যায়। পিলিহা রে বেটা, পিলিহা। সব লোকের পেটমে পিলিহা—পরবীনকো ভি পিলিহা—কেয়া হুয়া উস্‌মে?

নবীন রাগ করে বেরিয়ে যেত। গবিন সিং অগত্যা নিজেই গিয়ে হাঁকত—

—আঃ—আঃ—আঃ—ও—

পরবীন এসে হাজির হত, কিন্তু মন্থর গতিতে। নবীনের হাঁকে যেমন ছুটে আসত—তেমন ছুটে আসত না।

সেই প্রবীণ সেদিন মরল।

গোটা গ্রামটায় হৈ-হৈ পড়ে গেল। কথাটা অবশ্য আশ্চর্যের কথা। একটা ঘোড়ার মৃত্যুতে হৈ-হৈ পড়ে কোনকালে? পড়ে না, কিন্তু প্রবীণ যে আত্মহত্যা করলে! এও অবশ্য অবিশ্বাস্য কথা, কিন্তু লোকে বললে তাই। পৃথিবীর লোকে অবিশ্বাস করুক, গাঁয়ের লোকের দৃঢ় বিশ্বাস—প্রবীণ আত্মহত্যা করেছে। গ্রামের ধারে ছোট নদীটার উপর যে খুব উঁচু সাঁকোটা আছে, সেইখান থেকে ঝাঁপ খেয়ে নিচে পড়ে ঘাড় ভেঙে মরল প্রবীণ।

আগাগোড়াই তো সব তারা জানে—চোখে দেখলে।

নবীন অনেকদিন থেকেই প্রবীণের পেটের পিলের জন্য লজ্জিত ছিল। সে লজ্জা তার চারগুণ বেড়ে উঠেছিল বিয়ের পর। ক্রোশ-চারেক দূরে কামাৎপুর-পুণ্যার ছত্রীদের বাড়িতে নবীনের বিয়ে হল। প্রবীণের পিঠে চেপে শ্বশুরবাড়ি যেতে হল তাকে বাপের তাড়ায়। প্রবীণকে দেখে নবীনের শালারা আর ঠাট্টার সীমাপরিসীমা রাখলে না—নবীন, এটা চিঁ-হি করে ডাকে, না হুঁকো-হুঁকো করে ডাকে হে?

নবীন লজ্জা সত্ত্বেও বললে,—একবার চেপে দেখ না কেমন শিরপা করে লাফিয়ে ওঠে!

তার কথাটা শেষ হতে-না-হতে কামাৎপুরের ছত্রীদের তিনমণি ওজনের পরশুরাম সিংজী দাওয়ার উপর থেকে ঝপ্ করে প্রায় ঝাঁপিয়ে আচম্কা প্রবীণের পিঠে চেপে বসল। সঙ্গে-সঙ্গে কোঁক্—একটা শব্দ করে প্রবীণ পেছনের পা দুটো দুমড়ে বসে গেল।

সকলে হো হো করে হেসে উঠল। নবীনের মাথাটা যেন কাটা

গেল। ঠিক এই সময় নিজেদের ঘোড়ায় চেপে গ্রামান্তর থেকে উপস্থিত হল তার বড় শালা।

পুণ্যার ছত্রীদের ঘোড়াটা মস্ত বড়। নির্লজ্জ প্রবীণ সেটাকে দেখে ক্ষেপে উঠল। চিৎকার করে সামনের পা তুলে তাকে আক্রমণ করলে। বড় ঘোড়াটা বোধহয় তুচ্ছ করেই তার পানে পেছন ফিরে দাঁড়াল—অত্যন্ত ক্ষিপ্রভাবে দাঁড়িয়ে ঝেড়ে দিলে পেছনের জোড়া-পায়ের লাথি। বাস্!

প্রবীণের হুঙ্কারের আধখানা তার মুখেই থেকে গেল—সে চিৎ হয়ে উল্‌টে পড়ে গেল মাটিতে।

প্রবীণ কাৎরালো কি না নবীন তা বুঝতে পারল না, কামাৎপুরের ছত্রীদের সেই হা-হা করে হাসিতে আকাশ তখন ফেটে যাচ্ছে। নবীন তখন দেখতে পেলে, প্রবীণের নাক থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছে!

রাত্রে স্ত্রী বললে,—তুমি ঐ ছাগলটায় চেপে আর এসো না!

নবীন মনে মনে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করলে। আসবার সময় ঘোড়াটায় চাপলে না। লাগামের দড়ি ধরে টেনে হেঁটেই ফিরল।

শালারা বললে,—আ-হো সওয়ার, ই কেয়া বাত? চড়ো—তোমার পক্ষীরাজে চড়ো!

নবীন বললে,—বড় ঘোড়া কিনে তবে চড়ে আসব।

প্রবীণ কিন্তু দড়ির টানে চলবে না, সে ঘাড় টেনে দাঁড়িয়ে গেল। সওয়ার না হলে সে যেতে নারাজ। বার-কয়েক চিঁ-হি-চিঁ-হি করে বললে,—চড়ো, চড়ো! নাকে আমার চোট লেগেছে, ও কিছুই না। চড়ো তুমি।

নবীন চাবুকের বাঁটটা দিয়ে পিটতে শুরু করলে। পিছন থেকে পিটতে পিটতে তাকে চার ক্রোশ পথ ছুটিয়ে নিজেও ছুটতে-ছুটতে এল। বাড়িতে পৌঁছে বাপের সামনে চাবুকটা আছড়ে ফেলে দিয়ে বললে,—অকিঞ্চন ধোবার বাড়ি চললাম আমি।

—ধোবার বাড়ি? আভি? কাহে?

—তোমার প্রবীণকে আজ বেচব আমি।

গবিন সিং হুঙ্কার দিয়ে উঠল,—তুমকো হম্ বেচেঙ্গে! বুলাকি মেহথরকো পাশ বেচ্ দেঙ্গে!

নবীন থমকে দাঁড়াল এবার। বললে,—বেশ, তোমার বাড়ি থেকে চললাম আমি।

গবিন বললে,—আভি, আভি, আভি নিক্‌লো!

প্রবীণের ক্ষত-বিক্ষত দেহে সে হাত বুলোতে লাগল।

নবীন আলাদা হয়েই গেল। গবিন সিং তাতে দুঃখ করলে না। মরদের লড়কা মরদ, আপন হিম্মতে অর্থাৎ শক্তিতে করে খায়। বাপের রোজগারে যে খায় তার মরদানি কোথায়?

নবীন সত্যি মরদ। সে বেশ রোজগার শুরু করে দিলে। হাটে-হাটে গ্রামে গ্রামে সে ধান চাল কেনা-বেচা কারবার আরম্ভ করলে। বছর ছয়েক পরে একদিন সে তার শালার সেই বড় ঘোড়াটায় চেপে বাড়ি এল। পুরোনো বাড়িতে। বাপের বাড়িতে এসে বললে,—কিনলাম এটা।

গবিনের মুখ গম্ভীর হল। নবীনের শালাদের দেনা হয়েছে সে জানত, নিজেও কিছু টাকা পেত; টাকাটা অবশ্য এবার সে পাবে—কিন্তু নবীন এইভাবে টাকাটা নষ্ট করলে, এটা তার ভাল লাগল না। বড় ঘোড়া তার ছোলা চাই, জৈ চাই, দলাই-মলাই চাই। মনে হল তার প্রবীণের কথা। লক্ষ্মী—প্রবীণ তার লক্ষ্মী!

নবীন বললে,—তোমার আস্তাবলে ঘোড়াটা এখন থাকবে। ঐ গাধাটা থাকবে বাইরে এখন।

গবিন বললে—কেয়া করুঁ? নাচার! তুম্ লে-আয়া রুপেয়াকে মাল—

নবীন চালায় ঘোড়া বাঁধলে, দানা দিলে, পেছনের দিকে দুটো

খোঁটা পুঁতলে, পা টেনে দড়ি দিয়ে খোঁটার সঙ্গে বাঁধলে। প্রবীণের এসব দরকারও ছিল না, খোঁটাও ছিল না।

সন্ধেবেলা নবীন স্ত্রীকে বললে,—দেখ, পায়ে হেঁটে তোমার ভাইরা এখন থেকে আসবে এখানে—সেটা আমারই লজ্জা হবে। একটা কাজ করলে হয় না?

স্ত্রী মুখের দিকে চাইলে,—কী কাজ?

—প্রবীণকে তোমার ভাইদের দিয়ে দি। কী বল? ঘোড়া তো, ছাগল তো নয়! আর ছাগল যদিই হয়, তাতেই বা কী? পায়ে হাঁটার চেয়ে ভাল তো?

স্ত্রীর সঙ্গে একটা ঝগড়া বেধে যেত। কিন্তু তার পূর্বেই চিঁ-হি চিৎকারে গোটা পাড়াটা একেবারে হকচকিয়ে গেল।

নবীন লাফিয়ে উঠল,—গেল, প্রবীণ গেল! আজ আবার—

ছুটে গেল সে। গিয়ে যা দেখল, তাতে তার চক্ষুস্থির হয়ে গেল। প্রবীণ যায় নি, যেতে বসেছে বড় ঘোড়াটাই। আজ তার পেছনের পায়ে বাঁধা রয়েছে সে। সামনে গলায় বাঁধন। প্রবীণ দিঘি থেকে ফিরে তার আস্তাবলে সেই পুরোনো দুশমনকে দেখে ক্ষেপে গিয়ে তাকে আক্রমণ করেছে। বন্ধনদশার সুযোগ নিয়ে সে সামনের পা দুটো তার পিঠে চাপিয়ে কামড়ে ধরেছে তার ঘাড়। গবিন সিং তাকে পিটছে, বলছে,—ছাড়্ ছাড়্! তবু সে ছাড়ছে না।

নবীন প্রকাণ্ড এক লাঠি এনে পিটিয়ে তাকে ছাড়ালে। প্রবীণ বড় ঘোড়াটার ঘাড়টা থেকে খানিকটা মাংস খুলে নিয়েছে কঠিন আক্রোশে। নবীন বললে,—ওকে আমি মেরে ফেলব!

গবিন আজ আর প্রবীণের পক্ষ নিতে পারলে না। এমন ঘোড়া, এত টাকা দাম—তাকে জখম করে দিলে প্রবীণ! সে বিনয় করে বুঝিয়ে বললে,—গোস্‌সা মৎ করো বেটা। ভালা হো-যায়েগা। থোড়া সে হল্‌দি—

নবীন কোন কথা না বলে তার ঘোড়াটাকে খুলে নিচে চলে গেল।

প্রবীণ ঠুক-ঠুক করে তারা আস্তাবলে গিয়ে ঢুকল।

গবিন সিং মারা গেল মাস-দুয়েক পর। হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেল। নবীন বাড়িতে ফিরল না। এ বাড়িতে সে ধান-চালের গুদাম করবে। পাশাপাশি বাড়ি, নিজের নতুন বাড়িতে নিয়ে গেল তার মাকে। শুধু আস্তাবলের চালাটা ভেঙে দিল।

প্রবীণ সন্ধ্যায় এল, এসে সেই খোলা চালাতেই গিয়ে দাঁড়াল।

নবীন ওকে খুব ঘা-কতক দিয়ে তাড়িয়ে দিলে। কিন্তু সকালে উঠে দেখলে, প্রবীণ ঠিক সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে। সে আবার উঠল লাঠি নিয়ে। স্ত্রী বাধা দিয়ে বললে,—মারছ কেন?

—আপদকে দূর করতে হবে।

—না।

—তবে ওকে বেচে দেব আমি। আজই বেচে দেব।

—না।

—না তো ওকে কী করব আমি?

—ধান-চালের ছালা চাপিয়ে হাটে যাবে-আসবে। গোরুর গাড়ি ভাড়া লাগবে না।

—ঠিক। ঠিক। খুব খুশি হল নবীন।

বাপের শ্রাদ্ধ হয়ে গেলে নবীন সেদিন হাটে বার হল। ধান-চাল বেশ কিছু জমেছিল, ছালায় ভর্তি করে প্রবীণের পিঠে চাপিয়ে দিলে। নিজের বড় ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে কারবারের মজুরটাকে বললে,—ওটার দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চল্।

নিজে সে রওয়ানা হল। বড় ঘোড়াটা টগ্‌বগ্ করে বেরিয়ে গেল।

খানিকটা এসেই পেছনে শব্দ শুনে সে চমকে উঠল—চিঁ-হিঁ, চিঁহিঁ! ফিরে তাকিয়ে দেখলে—প্রবীণ ছালার বোঝা পিঠে নিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে। চিৎকার করছে, হিংস্র আক্রোশে দাঁত

বেরিয়ে পড়েছে। যে লোকটা দড়ি ধরে আনছিল তার কোন চিহ্ন নেই। প্রবীণ তার হাতের দড়ি ছিঁড়ে পাগলের মত ছুটে আসছে। নবীনের ঘোড়াও চঞ্চল হয়ে উঠল। সেও ডাকতে শুরু করে দিলে। নবীন রাশ টেনে তাকে বাগ মানাতে গেল। প্রবীণ এসে সামনের পা তুলে দাঁত বের করে আক্রমণ করতে চেষ্টা করলে। নবীন জিনের পাশে যে লাঠিটা বাঁধা ছিল সেটা খুলে নিলে। লাঠিটা সাংঘাতিক লাঠি, মাথায় ছুঁচলো একটা ফলা আছে—হঠাৎ চোখে পড়ে না। কিন্তু আক্রমণের সময় বেশ বল্লমের মত ব্যবহার করা যায়। কিন্তু তার আগেই তার বড় ঘোড়াটা ছুটতে শুরু করলে—ভয়ে ছুটতে শুরু করলে। প্রবীণ খোলা। সে সওয়ারের হাতে বাঁধা। তার উপর প্রবীণের দাঁতগুলোয় বড় ধার, সেকথা তার মনে আছে। নবীন রাশ টানলে—তবু সে মানবে না। ওদিকে প্রবীণও ছুটছে। প্রাণপণে ছুটছে। মোটা পেটটা যেন দৌড়ের লম্বা পা ফেলার টানে সরু হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়-দৌড়ে বাজি জেতবার জন্যই যেন সে ছুটছে। পিঠের ছালার বাঁধন খুলে ধান-চাল পড়ছে। প্রবীণ ছুটছে—ছুটছে—ছুটছে। দেখতে-দেখতে সে এগিয়ে এল। নবীনের ঘোড়াটা এবার থামতে চেষ্টা করলে। কিন্তু নবীন এবার তাকে ছোটালে। হাতে নিলে সেই লাঠিটা।

দুটো ঘোড়া ছুটছে।

প্রবীণ প্রাণপণে ছুটছে। এমন ছোটা তার কেউ কোনদিন দেখেনি। সেও জীবনে কোনদিন এমন ছোটা ছোটেনি।

রাস্তার লোক দেখছে। হাততালি দিচ্ছে।—কে জেতে?—কে জেতে?

—বলিহারি—বাহবা—প্রবীনোয়া! বাহবা—বাহবা!

সামনেই সাঁকোটা বাজি-জেতার চিহ্নিত স্থানের মত দাঁড়িয়ে আছে।

—বলিহারি প্রবীনোয়া! বলিহারি!

প্রবীণই পৌঁছল সেখানে বড় ঘোড়ার আগে।

বাস! আর তার জীবনের কী প্রয়োজন? উঁচু সাঁকোটার পাশের রেলিং অনেক দিন ভেঙেছে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড মেরামত করায় নি। বিশ হাত নিচে নুড়ি-পাথর-ভরা নদীর গর্ভ। প্রবীণ সেইখান দিয়ে খেলে ঝাঁপ।

নবীন সজোরে চেপে ধরলে তার ঘোড়ার লাগাম।

ঘোড়াটার ঠোঁট কেটে রক্তাক্ত হয়ে গেল। সে থামল। নবীন ঘোড়া থেকে নেমে কপালের ঘাম মুছে বললে,—শয়তান! গাধা!

লোকে চোখে দেখলে—প্রবীণ বাজি জিতে ইচ্ছে করে লাফিয়ে পড়ল সাঁকো থেকে।

প্রবীণের মৃতদেহও তারা দেখতে পেলে নদীর বুকে নেমে। ঘাড় গুঁজে পড়েছে বেচারি। ভেঙে গেছে ঘাড়টা।

কিন্তু ওর পেছনে পায়ের উপরে এগুলি কী? অনেকগুলি রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন?

———

মধু মাস্টার

সেদিন রবিবার। দেবীপুরের গোকুলের দোকানে হাটযাত্রীদের ভিড় জমিয়াছে। দরিদ্র দিন-মজুরেরা হাট করিবার জন্য চাউল বেচে—গোকুল কেনে। দোকানের বারান্দায় তক্তপোষের উপর মাধব ভট্টাচার্য একজন চাউল খরিদ্দার মহাজনের দালালের সহিত দাবা খেলিতেছিল।

এমন সময়,—ওরে গোকুল, একবার তামাক খাইয়ে দে তো বাবা!—বলিয়া দীর্ঘ, পরিপুষ্টদেহ এক প্রৌঢ় আসিয়া বারান্দায় উঠিলেন। ভদ্রলোকের একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি-গোঁফ। মাথার চুলগুলি ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা, সেগুলি কিন্তু একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। মাথার মধ্যস্থলে পরিপুষ্ট একটি টিকি।

তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র গোকুল সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—কে, মাস্টারমশাই?

সঙ্গে-সঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া সে তামাক সাজিতে বসিল।

মাধব ভট্টাচার্য বলিলেন,—কে গো, মধু মাস্টার? এস তো, এস তো ভাই! এই দেখ, ইনি একজন পাকা খেলোয়াড় এসেছেন, এস তো ভাই এক বাজি! আমি তো ভাই পাঁচ বাজির এক বাজিও পেলাম না।

অতি ব্যস্তভাবে মধু মাস্টার প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন,—না না না, ও হবে না ভাই, হাটে যেতে হবে আজ। ছোট ছেলেটার জ্বর হয়েছে, হাট পড়েছে আমার ঘাড়ে। ও বড় পাজি নেশা!

গোকুল তামাক সাজিয়া আনিল। হুঁকা-কলিকা সসম্ভ্রমে তাঁহার হাতে দিয়া কহিল,—অরুণ ভাল আছে মাস্টার মশাই ?

অরুণ মাস্টারের বড় ছেলে।

মাস্টারমশাই কহিলেন,—হ্যাঁ রে, সে ভাল আছে। সেদিন এসেছিল যে!

গোকুল আবার কহিল,—অরুণ এবার বি. এ. তেও স্কলারশিপ পেয়েছে, নয় মাস্টারমশাই ?

হ্যাঁ—রে, বি. এ. তেও ফার্স্ট হয়েছে। তোর সঙ্গে অরুণের বড় ভাব ছিল, নয় রে ? তারপর, তোর ব্যবসা কেমন চলেছে ?—হাঁ হাঁ হাঁ—মাধব, তোমার ঘোড়া গেল, ঘোড়া গেল! চাপা থেকে উঠে বস—বাঁয়ে, বাঁয়ে উঠে বস। আচ্ছা, হয়েছে। তারপর গোকুল, তোর মণকষা মনে আছে তো ? সেই কানমলা ?

গোকুল হাসিতে লাগিল।

তিনি বলিলেন,—যা যা, নিজের কাজ কর্ গিয়ে। হাটের দিন ব্যবসার ক্ষতি করিস নি বাবা....মাধব, এ আবার কী করেছ ? এ যে মন্ত্রী গেল তোমার! এক চাল, দু-চাল,...পাঁচ চালে যে মাৎ হয়ে গেলে তুমি! সর দেখি, সর দেখি একবার, দেখি দেখি দেখি—এ-এ-এ এ-ই!—বলিয়া একটি চাল তিনি চালিয়া দিলেন। মাধবকে চেষ্টা করিয়া সরিয়া যাইতে হইল না, মাস্টারের বিপুল শরীরের ধাক্কায় সে আপনি কোণে সরিয়া গিয়াছিল।

মধু মাস্টার দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে চাল ভাবিতেছিলেন। তাঁর খেলা—দেখিবার বস্তু। আশে-পাশে ক্রমশ লোক জমিতে লাগিল।

গোকুল ওদিকে কেনা-বেচা করিতেছিল,—পাঁচ সের এক পো হল গো তোমার। দাম হল তোমার পাঁচ দেড়ে সাড়ে-সাত আনা আর একপোর দাম দেড় পয়সা, সাত আনা সাড়ে তিন পয়সা। আচ্ছা, আট আনাই দিলাম তোমাকে আজ, এই হাটে কেটে দিও আধলাটা।

ওদিকে মাস্টার চাল চালিতে-চালিতে কহিতেছিলেন,—চিঁ-হি-হি; আমার সেপাই আপনার ঘোড়ার ডান পায়ে কোপ বসালে। আর দু-কোপ বাকি।

মাস্টার খেলার গতি ফিরাইয়া ফেলিয়াছিলেন। খেলোয়াড় ভদ্রলোক এক চাল দিয়া বলিলেন,—ফসকে গেছে কোপ।

মাস্টার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন,—না, পা দিয়েছে ওর। রক্তের তেজে এখনও বুঝতে পারে নি।

তারপর আর-একটি চাল দিয়া কহিলেন, এ-ই বাম পদ গেলেন। —বাঁ পা-টি লটর-পটর ডান পা-টি খোঁড়া—বাবা বল্লিনাথের ঘোড়া।

ভদ্রলোকটি বিপদ বুঝিয়াছিলেন। বহুক্ষণ চিন্তার পর নীরবে একটি চাল তিনি চালিলেন। মাস্টারের হাত উদ্যত হইয়াই ছিল, কোণের গজ তুলিয়া সশব্দে ঘোড়াটাকে বধ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, —শুঁড়ে ধরে আমার হাতির পায়ে আপনার ঘোড়ার পেট ফেটে গেল—ফট্!

তারপর মুখ তুলিয়া বলিলেন,—গোকুল, তামাক একবার। আবার ছকের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। অতঃপর নিঃশব্দেই কিছুক্ষণ খেলা চলিতেছিল। গোকুল তামাক আনিয়া হাতে ধরাইয়া দিয়া কহিল,—মাস্টারমশাই!

—হুঁ।

—বেলা অনেক হয়ে গেল। হাট—

মাস্টার কহিলেন,—গুড়ুম! ছাড়লাম টর্পেডো, সামলান নৌকো।

গোকুল ডাকিল,—মাস্টারমশাই!

—দ্যাখ্ গোক্‌লো, গোল করবি তো মার খাবি। খালি গোল-মাল, খালি গোলমাল! গেল নৌকো, চলেছে টর্পেডো—সোঁ সোঁ—

গোকুল আর কথা বলিতে সাহস পাইল না।

মাস্টার কহিলেন,—ভর-ভর-ভর-ভর ভূ—স!

বিপক্ষের নৌকা তিনি বধ কারয়াছেন।

আবার খেলা চলে। বেলা অনেক হইয়াছে। অনেকে চলিয়া গেল, আবার নূতন অনেকে আসিল।

হুঁকা টানিতে টানিতে মাস্টার বলিলেন,—ছাড়লাম ব্রহ্মবাণ। —ব্রহ্মতেজে সৃষ্টি তার নাম ব্রহ্মবাণ, অমর হলেও তার নাহি পরিত্রাণ।

ভদ্রলোক বলিলেন,—আমিও ছাড়লাম অগ্নিবাণ।

হা হা করিয়া হাসিয়া মাস্টার জবাব দিলেন,—আমার বরুণ বাণে অগ্নি নিভে যায়, এইবার মন্ত্রী যাবে করহ উপায়।

মন্ত্রী সত্যসত্যই গেল।

ভদ্রলোক ছকের উপর বলগুলা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—মাৎ হয়েছি আমি। কিন্তু আর-এক বাজি।

—যুদ্ধং দেহি? আচ্ছা, প্রস্তুত আমি।

আবার খেলা বসিল।

খেলা যখন ভাঙিল তখন অপরাহ্ণ বেলা। মাস্টার জয়োল্লাসে উঠিয়া কহিলেন,—চল এইবার হাট।

কিন্তু বেলার দিকে চাহিয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন,—একি! এ যে সন্ধে হয়ে এল! হাট?

গোকুল ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—হাট আমি পাঠিয়ে দিয়েছি মাস্টারমশাই।

দিয়েছিস? বাঁচলাম আমি। ওঃ, ভারি পাশি নেশা! মাধবকে তাই তো বলি, ছাড়, ও নেশা ছাড়। তা, কাকে বলছ!—দে তো বাবা একটু তেল দে তো, একেবারে স্নানটা সেরেই যাই।

গোকুল হাতজোড় করিয়া বলিল,—বামুন দিয়ে রান্নাও আমি করিয়ে রেখেছি মাস্টারমশাই, বাড়িতেও খবর দিয়েছি।

বেশ করেছিস। এসব বুদ্ধি তোর আছে, খালি ইংরিজি গ্রামারেই তোর যত গোল!

মধু মাস্টারের পূরা নাম মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। মাস্টার

সে-আমলের এফ. এ. পাশ। দারিদ্র-হেতু বি. এ. পড়া তাঁহার হয় নাই। পাশের গ্রামের রায়বাবুদের এম্. এল. হাই ইংলিশ স্কুলে আজ ত্রিশ বৎসর থার্ডমাস্টারি করিতেছেন। এ-অঞ্চলের চল্লিশের নিম্নবয়স্ক শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই তাঁহার ছাত্র। রায়বাড়ির কর্তা জ্ঞানদাবাবু মধু মাস্টারকে বড় ভালবাসেন। তাঁহার বড় ছেলেকে তিনি প্রাইভেট পড়াইয়াছেন, আবার ছোট ছেলে সৌরীন্দ্রকে এখনও পড়ান।

সেদিন গোকুলের দোকান হইতেই মধু মাস্টার রায়বাড়িতে সন্ধ্যার সময় গিয়া উঠিলেন। এই নিয়মিত কর্মটিতে কেহ কখনও তাঁহাকে অনুপস্থিত দেখে নাই। জল ঝড় শত দুর্যোগের মধ্যেও সাদা-তালি-দেওয়া বিবর্ণ ছাতাটি দীর্ঘ মানুষটির মাথার উপর বহু দূর হইতেই দেখা যাইত।

ছাত্র সৌরীন্দ্র ছেলেমানুষ, সবে ইংরেজি ধরিয়াছে। মাস্টার-মহাশয় উপস্থিত হইতেই সৌরীন্দ্র কহিল,—আজ দুপুরবেলা পড়া করে রেখেছি মাস্টারমশাই।

ছাতাটা কোণে রাখিয়াই মাস্টারমশাই গর্জন করিয়া উঠিলেন,—সিট ডাউন, ইউ নটি বয়!

এত বড় মানুষটির রোষ-আস্ফালনের গর্জনে সৌরীন্দ্রের হইয়া গেল। সে বই খুলিয়া বলিল,—আই মানে আমি, মেট মানে দেখিয়াছিলাম, এ মানে একটি, লেম মানে খোঁড়া, ম্যান মানে মনুষ্য।

সৌরীন্দ্রের চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল। মাস্টার তাহা দেখিয়াছিলেন, কিন্তু পাথরের মত তিনি বসিয়া রহিলেন। ধীরে ধীরে সৌরীন্দ্রের মন পাঠে নিবিষ্ট হইয়া আসিতেছিল। মাস্টার বলিলেন,—বই বন্ধ কর। এদিকে এস।

ভয়ে-ভয়ে সৌরীন্দ্র অগ্রসর হইয়া আসিল।

তাহার হাতে ঝাঁকি দিয়া তিনি কহিলেন, দিন-দিন রোগা হয়ে যাচ্ছিস। খুব করে ভাত ডাল খাবি, বুঝলি? হাম-হাম করে। দু-বেলা ওঠ-বোস করবি, বুঝলি?

সৌরীন্দ্র ঘাড় নাড়িল, সে বুঝিয়াছে।

তারপর পরীক্ষা আরম্ভ হইল।

—আচ্ছা বল দেখি,—আমি যাই—ইংরেজি কী হবে?

—আই গো।

—গুড। আচ্ছা,—সে যায়?

—হি গোজ।

—ভেরি গুড। রাম যায়?

—রাম গোজ।

—ভেরি ভেরি ভেরি গুড। আচ্ছা। অঙ্ক হয়েছে?

—হ্যাঁ স্যার, সব কষে রেখেছি।

—আচ্ছা, একটা মণকষা কষে ফেল দেখি! এক মণ মিষ্টির দাম—কী মিষ্টি ভালবাস তুমি? রসগোল্লা? পান্তুয়া? আচ্ছা। একমণ পান্তুয়ার দাম পাঁচ টাকা পনের আনা পাঁচ পাই হলে তিন মণ ন সের ছ-ছটাকের দাম কত?

সৌরীন্দ্র কহিল,—ততক্ষণ আপনি বইখানার মলাট লাগিয়ে দিন না স্যার! বই ও একখানা খবরের কাগজ সে টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। মাস্টার কাগজখানা লইয়া ভাঁজিতে গিয়া তাহার উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন। সৌরীন্দ্রের অঙ্ক শেষ হইয়া গেল, সে ডাকিল,—স্যার!

মাস্টার নিবিষ্ট চিত্তে পড়িতেছিলেন, কোন উত্তর দিলেন না।

সৌরীন্দ্র আবার ডাকিল,—হয়ে গেছে মাস্টারমশাই।

টেবিলের উপরে প্রচণ্ড একটা কিল মারিয়া বিপুল গর্জনে মাস্টার বলিয়া উঠিলেন,—অ্যাবসার্ড! এ ভাইল অ্যাণ্ড ম্যালিসাস প্রপাগাণ্ডা এগেনস্ট আস—

সৌরীন্দ্র অর্থ না বুঝিয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল। মাস্টারের এরূপ ধরনের অস্বাভাবিক গর্জনে কাছারিঘরে রায়কর্তা জ্ঞানদাবাবুর আফিঙের নিদ্রাও ভাঙিয়া গিয়াছিল। তিনি ডাকিয়া কহিলেন,—কী হল, কী হল মাস্টারমশাই?

আবার টেবিলের উপরে কিল মারিয়া মাস্টার কহিলেন,—এ আমি কখনও ছাড়ব না। আমি এর বিরুদ্ধে লিখব—প্রমাণ করব। আমি শ্যাল প্রুভ ইট।

জ্ঞানদাবাবু উঠিয়া আসিলেন, কহিলেন,—কী, হল কী মাস্টার-মশাই? আপনি এত—

—এত! বলেন কী আপনি? পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে যাচ্ছে! মাথায় আমাদের জুতো মারছে! বলে কি,—ইণ্ডিয়ান সিভিলাইজেশন, মানে, আমাদের সভ্যতার ইতিহাস মিথ্যে। রামায়ণ মহাভারত মিথ্যে। মিশরের সভ্যতা নাকি সবার আগে। তারই খানিকটা ভারতীয়েরা নকল করেছিল মাত্র। নইলে তারা ছিল বর্বর, অসভ্য। এই নিয়ে বিলেতে একখানা বিরাট গ্রন্থ রচনা হয়েছে মশাই। খবরের কাগজে কাগজে তার প্রশংসা। এই দেখুন একখানা বিলিতি কাগজে তার সমালোচনা,—সমালোচনা না মাথা, সেই নিয়ে ঢাক বাজাচ্ছে! আমি লিখব, এর বিরুদ্ধে আমি লিখব জ্ঞানদাবাবু!

জ্ঞানদাবাবু বলিলেন,—লিখুন না আপনি। লিখে আমাদের দেশের কাগজে পাঠিয়ে দিন।

মাস্টার তখনও বলিতেছিলেন,—ওদের র‍্যামেসিস বলে যে রাজা ছিল তারই নাম কীর্তি চুরি করে আমরা রামরাজার নাকি বড়াই করি। ব্যাটাদের নীল ডাউন করে দিতে হয় পৃথিবীর সামনে! কিন্তু খবরের কাগজে লিখে কী হবে মশাই? ঐ বইখানার প্রতিবাদ করে বই লেখা দরকার, আর সে বই ওদের দেশেই প্রচার করা দরকার!

জ্ঞানদাবাবু ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন,—লিখুন আপনি মাস্টার মশাই, আমি আপনাকে সাহায্য করব। বিদ্যে আমার নেই, কিন্তু অর্থ দিয়ে সাহায্য করব—যা খরচ হবে এতে সমস্ত আমার।

মাস্টার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন, ভাব-প্রকাশের ভাষা তিনি পাইতেছিলেন না। কয়ফোঁটা জল তাঁর চোখ দিয়া ঝরিয়া পড়িল।

অবশেষে কহিলেন,—আমাদের ভারতবর্ষ আর্যভূমি, আপনার মঙ্গল হবে জ্ঞানদাবাবু!

সৌরীন্দ্র নিজেই চুপ করিয়াছিল। এ রোষ যে তাহার উপর নয় তাহা বুঝিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে। এতক্ষণে সে সুযোগ বুঝিয়া কহিল,—স্যার আমার ছুটি?

মাস্টার তখনও চিন্তা করিতেছিলেন।

জ্ঞানদাবাবু ছেলের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন,—মাস্টারমশাই, সৌরীন আপনার ছুটি চাচ্ছে।

গম্ভীরভাবে মাস্টার জ্ঞানদাকেই বলিলেন,—যাও। না, দাঁড়াও, অঙ্কটা দেখি তোমার।

অঙ্ক ঠিক হইয়াছিল। স্লেটখানি সৌরীনের হাতে দিয়া এতক্ষণে সৌরীনের দিকে চাহিয়া সস্নেহে বলিলেন,—ইউ আর এ গুড বয়। আজ পড়া তোমার ঠিক হয়েছে!

মাস্টার উঠিলেন, বলিলেন,—কাল তাহলে বইখানা আনতে দেব, কী বলেন? একবার হেডমাস্টারের ওখানে যেতে হবে। তাঁকেও সঙ্গে নিতে হবে।

হেডমাস্টার শিববাবু মধু মাস্টারের সমবয়সী লোক। তিনি শিবের মত এই সরল আত্মভোলা মানুষটিকে বড় ভালবাসিতেন। লোকটির জ্ঞান ও সামর্থ্যের উপর বিশ্বাসও ছিল তাঁর অগাধ। শিববাবু বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কিন্তু কোন প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখিলে মধু মাস্টারকে না দেখাইয়া কখনও তিনি শেষ করিতেন না। মধু মাস্টার অম্লান বদনে তাঁহার লেখার উপরেও দুই-এক স্থানে কলম চালাইয়া বলিতেন,—এখানটা এই করে দিলাম।

শিববাবুও তাহাই মানিয়া লইতেন।

সেই রাত্রে মাস্টার শিববাবুর দরজায় আসিয়া হানা দিলেন।

শিববাবু অতি মিতাচারী ব্যক্তি। নিয়মের খণ্ডন তিনি করেন না। সন্ধ্যার মধ্যে শুইয়া পড়া তাঁহার নিয়ম।

মাস্টারের হাঁক-ডাকে দরজা খুলিয়া দিয়া ভৃত্য কাহল,—বাবু খেয়ে শুয়েছেন।

মাস্টার বলিলেন,—ডাক তাঁকে। জরুরি কাজ আছে। ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট,—মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট, বুঝলে?

মধু মাস্টারের কণ্ঠস্বর ইট-কাঠের বাধা মানে না, শিববাবুর কানে গিয়া আপনি পৌঁছিয়াছিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া নামিয়া আসিলেন।

—কী, কী হয়েছে মাস্টারমশাই?

—এই পড়ে দেখুন!

কাগজখানা টেবিলের উপর ফেলিয়া দিলেন।

পড়া শেষ হইলে শিববাবু কিছু বলিবার পূর্বেই মাস্টার বলিয়া উঠিলেন,—এর বিরুদ্ধে লিখতে হবে! ও বই মিথ্যে, তা প্রমাণ করে দিতে হবে!

শিববাবু বলিলেন,—এইজন্যেই ডেকেছিলেন?

—এইজন্যেই? হোয়াট ডু ইউ মীন? এটা একটা তুচ্ছ জিনিস?

—না না না। কিন্তু এ তো কাল সকালে—

মাস্টার বলিয়া উঠিলেন,—নাঃ, আপনাকে দিয়ে আর কিছু হবে না। আপনি বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন দিন দিন। বই লিখতে হবে। কাল ও বইখানা আনতে দিচ্ছি। জ্ঞানদাবাবু সমস্ত খরচ দেবেন। আচ্ছা, চলি আমি—বলিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

বাড়ির দরজায় আসিয়া মাস্টার মৃদুস্বরে ডাকিলেন,—চিনু, চিনু—চিনু মা!

চিনু—চিন্ময়ী, মাস্টারের কন্যা, বিধবা।

দরজা খুলিয়া গেল। বেশ বোঝা গেল প্রতীক্ষমানা কেহ এই আহ্বানটির প্রতীক্ষাতেই উদ্‌গ্রীব হইয়া ছিলেন। দ্বারমুক্তকারিণী

চিন্ময়ী নয়—চিন্ময়ীর জননী। তাঁহাকে দেখিয়া মাস্টার কহিলেন—আজ বুঝেছ কিনা—আমাদের অরুণের বন্ধু, আমার ছাত্র বুঝেছ কিনা—মানে—আমাদের দেবীপুরের গোকুল—বুঝেছ—

গৃহিণী গম্ভীরভাবে কহিলেন,—খুব বুঝেছি আমি।

মাস্টার তাড়াতাড়ি বলিলেন,—না, না, মানে—ছাত্র সে, ধরলে যখন—বুঝলে কিনা—

জলের ঘটি ও গামছা নামাইয়া দিয়া স্ত্রী কহিলেন,—বললাম তো সবই বুঝেছি।

হাত মুখ ধুইতে ধুইতে মাস্টার কহিলেন,—ঐ তো—সবতাতেই তোমার রাগ! বুঝবে না কিছু—

—খুব বুঝেছি।

—কী বুঝেছ শুনি?

—বুঝেছি, সবই আমার অদৃষ্ট।

মাস্টার পরাজয় মানিয়া লইলেন। বলিলেন,—আচ্ছা বাবু আচ্ছা, তাই হল। এখন ভাত দাও দেখি।

ভাতের থালা নামাইয়া দিয়া গৃহিণী বলিলেন,—কেন, দাবা খেললে পেট ভরে না?

মাস্টার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। লোকে পাগলই বলুক আর যাই বলুক,—রাগ, অনুরাগ বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল।

বিপুল উদ্যমে বই লেখা চলিয়াছে। সে বইখানি আসিয়াছে। সঙ্গে আরও তিন-চারি শত টাকার বই কেনা হইয়াছে। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস লিখিতে এই বইগুলির সাহায্য প্রয়োজন। মাস্টার রাত্রি জাগিয়া সেই সমস্ত বই পড়েন। শিববাবুর সহিত আলোচনা হয়। মধ্যে-মধ্যে জ্ঞানদাবাবুকে অনুবাদ করিয়া শোনানো হয়।

কিন্তু এই পরিশ্রমে মধু মাস্টারের পাথরের মত দেহ ভাঙিয়া পড়িল। সর্বদাই যেন তিনি চিন্তাকুল। দাবা খেলা পর্যন্ত ছাড়িয়াছেন।

দেখিয়া শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে অরুণকে পত্র লিখিলেন। অরুণ কৃতী ছেলে—এম. এ. পড়ে। কোন পরীক্ষায় সে দ্বিতীয় হয় নাই। অরুণ সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া কহিল,—বাবার ইচ্ছেয় বাধা দিয়ো না, মা। উনি যে কত বড় তা তোমরা বুঝবে না।

মা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন,—বুঝব না, না?

অরুণ লজ্জিত হইয়া পড়িল। সে কহিল,—আমি বরং স্কলারশিপের টাকা থেকে কিছু করে পাঠিয়ে দেব। বাবার জন্যে ভাল খাবার-টাবারের ব্যবস্থা কর।

কিন্তু মানুষের ইচ্ছায় কিছু হয় না। অকস্মাৎ জ্ঞানদাবাবু মারা গেলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সুরেন্দ্রনাথ মালিক হইয়া বসিল। সুরেন্দ্র বার-তিনেক ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়া শিক্ষকদের উপর সন্তুষ্ট ছিল না। তাহার উপর সে নবযুগের মানুষ। শিববাবু মানে-মানে বয়সের অজুহাত দেখাইয়া সরিয়া পড়িলেন। মধু মাস্টারকেও বলিলেন,—মাস্টারমশাই, আর কেন!

হা-হা করিয়া হাসিয়া মাস্টার বলিলেন,—আপনার সবতাতেই বাড়াবাড়ি, শিববাবু! আরে, আমাদের সেই সুরেন তো? তিন চড়ে সোজা করে দেব!

শিববাবু শুধু হাসিলেন, আর দ্বিতীয় অনুরোধ করিলেন না। এটুকু তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব। তিনি কাশী চলিয়া গেলেন।

শিববাবুর স্থলে একজন নূতন এম. এ. বি. টি. আসিলেন। সবই যেমন চলিতেছিল, চলিতে লাগিল। সেদিন আরও কতকগুলি পুস্তকের তালিকা লইয়া মধু মাস্টার রায়বাড়িতে গিয়া হাজির হইলেন।

বলিতে ভুলিয়াছি—ইতিমধ্যে সৌরীন্দ্রের গৃহশিক্ষকের পদটি তাঁহার গিয়াছে। নূতন হেডমাস্টার মহাশয় নিজে সৌরীনের ভার লইয়াছেন। তাহাতে মধু মাস্টারের কোন আক্ষেপ ছিল না, বরং

তিনি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছেন। বইখানা দ্রুততর গতিতে লেখা হইতেছে। বৈঠকখানার চিরমুক্ত দুয়ার আবৃত করিয়া পর্দা ঝুলিতেছিল। দরজার মাথার উপরে লেখা রহিয়াছে—বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ। মাস্টার কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করিলেন না, বরাবর পর্দা ঠেলিয়া ঢুকিয়া পড়িলেন। সুরেন্দ্র সিগারেট মুখে তাকিয়ার উপর ঠেস দিয়া শুইয়া ছিল। মধু মাস্টারকে দেখিবামাত্র সিগারেটটা মুখ হইতে খসিয়া তাহার বুকের উপর পড়িয়া গেল। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক মধু মাস্টার, সুরেন্দ্রের বুক হইতে তাড়াতাড়ি সেটাকে লইয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—এই রাবিশগুলো খাও কী জন্যে বাপু? বাপঠাকুরদার আমলের সোনারুপোর ফরসি গড়গড়া থাকতে—হ্যাঃ! অম্বুরি তামাক খাবে—এক মাইল তার গন্ধ যাবে! তা না—

সুরেন্দ্র এতক্ষণে আত্মস্থ হইয়া উঠিয়াছিল, সে কহিল,—কোন দরকার আছে কি?

—হ্যাঁ, দরকার বলে দরকার! জরুরি দরকার! সব কাজ বন্ধ হয়ে আছে। এই বইগুলো চাই।

তিনি ফর্দটা সুরেন্দ্রের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন।

ফর্দটায় চোখ বুলাইয়া সুরেন্দ্র কহিল,—কী হবে এতসব বই? আর হেডমাস্টারের সই-ই বা কোথায়?

মাস্টার বিরক্তিভরে কহিলেন,—আঃ, তোমার বুদ্ধি কি চিরকাল একভাবে থাকবে বাপু! অ্যালজেব্রা জিওমেট্রি তো কোনকালে মাথায় ঢোকেনি তোমার, এখনও কি তাই আছে? এ-বইগুলো লাগবে, আমি যে-বইখানা লিখছি তার জন্যে।

—আপনি বই লিখবেন, তার জন্যে বই আমায় কিনে দিতে হবে—তার মানে?

মাস্টার সচকিত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন,—মানে জ্ঞানদাবাবুর অনুমতিক্রমেই বইখানা আমি লিখতে আরম্ভ করি। তিনি সমস্ত

খরচ দেবেন বলেছিলেন এবং এর জন্যে অনেক টাকা খরচও হয়ে গেছে। প্রায় তিন-চারশো টাকার বই কেনা হয়েছে।

—কী বই এখানা?

—সে বিশেষ বুঝবে না তুমি বাপু! তবে শোন। বিলেতে একখানা বই লেখা হয়েছে ভারতীয় সভ্যতার অসারত্ব প্রতিপন্ন করে এবং তার আদিমত্ব নাকচ করে। এখানা তারই প্রতিবাদ।

সুরেন্দ্র ধীরে ধীরে কহিল,—দেখুন, বাবাকে ভালমানুষ বোকা পেয়ে অনেকে অনেক রকম করে নিয়েছে। কিন্তু তা আর হবে না। এসব ধাপ্পাবাজি আমি অনেক বুঝি। বিলেতের ইংরেজের বইয়ের প্রতিবাদ লিখবেন শাঁখপুরের মধু মুখুজ্জে! আপনার লিখতে শখ থাকে নিজে খরচ করে লিখুন গিয়ে।

মধু মাস্টার উঠিয়া পড়িলেন। শুধু বলিলেন,—দেখ সুরেন্দ্র, আমাকে তুমি যা বললে তাই বললে; কিন্তু স্বর্গীয় কর্তাকে বোকা বলা তোমার উচিত হয় নি। তাই বা কেন? তোমারই উপযুক্ত হয়েছে!

তিনি পর্দা ঠেলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ভিতর হইতে সুরেন্দ্র কহিল,—যে বইগুলো আপনার কাছে আছে—

কথা শেষ মাস্টার নিজেই করিয়া দিলেন, বলিলেন,—পাঠিয়ে দেব আজই।

সেই দিনই একটা লোকের মাথায় একগাদা বই ও একখানি পত্র লইয়া দেবীপুরের গোকুল আসিয়া সুরেন্দ্রবাবুকে প্রণাম জানাইল। পত্রখানি মধু মাস্টার লিখিয়াছেন—স্কুলের কার্যে পদত্যাগ-পত্র সেখানি।

দিন-কয়েক পরে মধু মাস্টার স্ত্রীকে কহিলেন,—দেখ, একবার কলকাতা যাচ্ছি আমি।

স্ত্রী শঙ্কিত হইয়া কহিলেন,—সেকি? এই শরীর তোমার—

বাধা দিয়া মাস্টার বলিলেন,—তা হোক, কাজকর্ম একটা দেখব সেখানে। একজন ছাত্রও চিঠি লিখেছে। আর অরুণও সেখানে আছে। এই ধর, দিন-দশেক বড়-জোর। কোন ভাবনা নেই। গোকুল মাসকাবারের জিনিসপত্র সব দিয়ে যাবে।

স্ত্রী ব্যথিত স্বরে বলিলেন,—আমাদের ভাবনাই আমরা শুধু ভাবি, নয়? পেটের ভাবনা ছাড়া—

অর্ধপথেই মাস্টার বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন,—যাঃ গেল! তুমি কিছু বোঝ না!

—না, বুঝি না। সে তুমি বল, অরুণ বলে, আবার ঐ ছোট খোকা সেও দশদিন পরে তাই বলবে। বেশ, কী কী দেব বল তো? তোমার ও কাগজের বস্তা—

হাঁ-হাঁ করিয়া মাস্টার বলিয়া উঠিলেন,—না না না। ওতে তুমি হাত দিও না। ও আমি গুছিয়ে নেব।

—কেন? মুখ্যু মানুষে হাত দিলে কি ওসব পচে যায় নাকি?

—আঃ। কী বিপদ! কে বলছে তা? কিছু বোঝ না তুমি! মাস্টার কলিকাতা রওনা হইয়া গেলেন।

সন্ধ্যায় ছোট ছেলে বরুণ আসিয়া কহিল,—মা, বাবা সেই দু-ফসলী জমিখানা বিক্রি করেছেন হরিশ সাহাকে। আমি শুনে এলাম।

মা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এই জমিটুকু খুব উৎকৃষ্ট জমি। আখ, কলাই, গম প্রভৃতি সকল ফসলই হইয়া থাকে। এটুকু মাস্টারের বড় শখের সামগ্রী ছিল।

বহুক্ষণ পর মা বলিলেন,—বুড়ো বয়সে মতিচ্ছন্ন হয় মানুষের কানে শুনেছিলাম, এইবার চোখে দেখলাম। ঐ কাগজই ওর মাথা খেলে। ওতেই আমার সর্বনাশ হবে সে আমি বেশ জানি।

বরুণ বলিয়া উঠিল,—ছি মা! যা বোঝ না তুমি, সে নিয়ে কিছু বোলো না।

মা কিছু বলিলেন না।

কিন্তু টপটপ করিয়া জল চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

কলিকাতায় আসিয়া মাস্টার উঠিলেন কালীঘাটে—এস্. সি. সিংহ, উকিল, হাইকোর্ট—তাঁহার বাড়িতে। সতীশ সিংহ তাঁহার ছাত্র। মোটমাট নামাইয়াই মাস্টার বরাবর সতীশের ঘরে হাজির হইলেন। একঘর মক্কেল বসিয়া ছিল। সকলের সম্মুখেই তিনি কহিলেন,—সতীশ, ভাল আছিস তো?

সবিস্ময়ে সতীশ কহিল,—কে, মাস্টার মশাই? কখন এলেন?

—এই আসছি বাবা! তোর এখানে উঠেছি এসে। কিছুদিন থাকব এখানে।

—অ, তা বেশ—তা বেশ। ঐ দিকে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফেলুন।

মোট কথা, সতীশ সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহার ছিল পান-দোষ ও আনুষঙ্গিক দোষ। অভিভাবক—বিশেষ মধু মাস্টারের মত অভিভাবক লইয়া চলা তাহার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর।

আহারের সময় মাস্টার বলিলেন,—বাবা সতীশ, আমাকে কিছুদিন ভাত তোমাকে দিতে হবে। আমি তোমার ছেলেকে পড়াব।

কোর্টে যাইবার পোশাকে সতীশ সম্মুখে দাঁড়াইয়া পরিচর্যার তদারক করিতেছিল, সে বলিল,—দেখুন, একটা কথা—বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু না বললেও নয়। আপনার মত কঠোর শাসনের মধ্যে ছেলেকে রাখা আমার মত নয়। শিশুরা হার্টলেস—

একান্ত ব্যথিত ভাবে মাস্টার বলিয়া উঠিলেন,—হার্টলেস—আমি হার্টলেস, সতীশ?

সতীশ তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

মাস্টারও আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়াছিলেন।

অন্নব্যঞ্জন তখন সমস্ত যেন তিক্ত হইয়া গিয়াছে।

হাত-মুখ ধুইয়াই তিনি উচ্চকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন,—আমি চললাম সতীশ। অরুণের ওখানে যাচ্ছি।

অরুণের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া একটা মেসের নিচের তলার একখানি ঘর ভাড়া লইয়া মাস্টার সেইখানে বাসা গাড়িলেন। খাওয়া-দাওয়ার পর ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে যান। বৈকালে অরুণ আসে। তাহার সহিত সমালোচনা হয়। বড় আনন্দে তাঁহার দিন কাটে। সন্ধ্যার পর একটি প্রাইভেট টুইশন জুটিয়াছে। পনেরো টাকা সেখানে পাওয়া যায়। সে টাকার দশ টাকা তিনি বাড়িতে পাঠান। অরুণ এটুকু জানে না। সে নিজে তাহার বৃত্তির টাকা হইতে দশ টাকা করিয়া বাড়িতে পাঠাইতে থাকে।

সেদিন কিসের ছুটি ছিল। অরুণ দ্বিপ্রহরে আসিয়া দেখে, এক-রাশ রঙিন কাগজ ও কতগুলি তার লইয়া বাবা কি করিতেছেন। সবিস্ময়ে সে প্রশ্ন করিল,—এগুলো কী হবে?

অপ্রস্তুত হইয়া লজ্জার সহিত মাস্টার বলিলেন,—ফুল তৈরি করছিলাম। এগুলো বেশ বিক্রি হয়। আরও একদিন করেছিলাম, দু-টাকা লাভ হয়েছিল।

অরুণের চক্ষে জল আসিল, সে কহিল,—বাবা, আমি চাকরি নিই—আপনি কষ্ট করবেন না।

স্থির দৃষ্টিতে অরুণের দিকে চাহিয়া তিরস্কারের সুরে তিনি শুধু কহিলেন,—অরুণ!

অরুণ মাথা নত করিয়া রহিল।

তিনি বলিলেন,—আমার কল্পনা তুমি, অরুণ; আপন খেয়ালে আপনাকে তুমি নষ্ট কোরো না। তাতে হয়ত আমার দেহের কষ্ট দূর হতে পারে, কিন্তু মনের কষ্টে আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

কিছুক্ষণ পর ঈষৎ হাসিয়া আবার তিনি কহিলেন,—সাধনা সামান্য বস্তু নয় অরুণ। কৃচ্ছ্রসাধন ভিন্ন সাধনা হয় না বাবা। আমার দিকে তাকিয়ো না, এ আমার সাধনা।

দিন কাটিতেছিল। মাস-দুই কাটিয়া গেল। সেদিন সন্ধ্যায়

আসিয়া অরুণ দেখিল, পিতা শুইয়া আছেন। অরুণকে দেখিয়া তিনি কহিলেন,—বাবা অরুণ, আমায় দেশে নিয়ে চল বাবা। সামান্য কাজ বাকি আছে—দিনও বোধহয় অল্প বাকি। তোমার মায়ের কাছে যেতে চাই আমি।

বাড়িতে আসিয়া তিনি ক্রমশ সুস্থ হইয়া উঠিতেছিলেন। যে কাজটুকু বাকি ছিল সেটুকু ধীরে-ধীরেই করিতেছিলেন। কিছুদিন পর সেদিন শরীর যেন সুস্থ, একান্ত গ্লানিহীন বলিয়া বোধ হইল। দিন-দুই পরই আবার তিনি বিপুল পরিশ্রম আরম্ভ করিয়া দিলেন।

স্ত্রী আপত্তি করিয়া কাগজ-কলমের ঘরে চাবি দিয়া বলিলেন,—আগে তুমি বিষ এনে দাও আমাকে!

মাস্টার কহিলেন,—কী যে বল তুমি! তুমি কি চিরদিনই কিছুই বুঝবে না?

চাবিটি ফেলিয়া দিয়া স্ত্রী কহিলেন,—এই নাও। কিন্তু একবার বল—সব বুঝেছি আমি!

দ্বিপ্রহর রাত্রে মাস্টার বিকৃত স্বরে ডাকিলেন,—অরুণের মা!

তিনি ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, মাস্টার বিছানার উপর পড়িয়া আছেন। নাক মুখ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে।

ডাক্তার আসিয়া বলিল,—মাথার শিরা ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

ভোর রাত্রে প্রলাপের মত মাস্টার বলিতেছিলেন,—অরুণ, বই শেষ হয়েছে। ফোরওয়ার্ডটা বাকি থাকল,—দেখিস, তুই দেখিস।

কাহিনীর এইখানেই শেষ—কিন্তু আরও একটু আছে। সেটুকু না বলিলে শেষ হইবে, কিন্তু সম্পূর্ণ হইবে না।

অরুণ এম. এ. তে ফার্স্ট হইয়া স্টেট স্কলারশিপ লইয়া বিলাত গিয়াছে।

বছর-দুই পরে বরুণ একদিন ছুটিয়া আসিয়া মাকে কহিল,—মা, বাবার ছবি আছে ?

মা কহিলেন,—কেন ?

—বাবার বই বেরিয়েছে, মা! বিলেতের কাগজে-কাগজে তার প্রশংসা। দাদা লিখেছেন, বইয়ের দাম হিসাবে পাঁচ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। সকলে ওখানে বাবার ছবি চায়, ছাপবে।

মা কহিলেন,—কী লিখেছে তারা বরুণ ?

—সে তো সব ইংরিজি, মা। এর পর বাংলা করে শোনাব। কিন্তু বাবার ছবি ?

মা বলিলেন,—না বাবা, ছবি তো নেই।

———